ISSN-1813-0372

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বর্ষ: ১২ সংখ্যা: ৪৬
এপ্রিল-জুন: ২০১৬

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল - জুন ২০১৬

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল “ইসলামী আইন ও বিচার”-এর ৪৬ তম সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এ সংখ্যায় ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বাংলাদেশের প্রথিতযশা গবেষকগণের প্রণীত ৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে ড্রাইভিং গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। যোগাযোগ ও চলাচলের ক্ষেত্রে পুরোনো অনেক পন্থা অচল হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে ইসলামী ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে ড্রাইভিং-এর মত আধুনিক বিষয়ের আলোচনা এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি-বিধান নিরূপণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে “ইসলামী শরীআহর আলোকে ড্রাইভিং : একটি পর্যালোচনা” শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। প্রবন্ধে ইসলামী শরীআহ-এর আলোকে ড্রাইভিং, ড্রাইভার বা চালকের যোগ্যতা, দায়িত্ব-কর্তব্য, নিরাপদ সড়ক, ট্রাফিক আইন, যানবাহন তথা গাড়ির বৈশিষ্ট্য এবং দুর্ঘটনার দায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামে মানবতার কল্যাণ ও জীবনঘনিষ্ঠ সব বিষয়ের বিধি-বিধান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষের চলাচল ও জনপথ সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রেও ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নীতিমালা। পথঘাটের ব্যবহার, উপকার ভোগ এবং রক্ষণ বেক্ষণ সম্পর্কে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহে নির্দেশনা রয়েছে এবং ইসলামী ফিকহের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা বিধৃত হয়েছে। যা থেকে বর্তমান সময়ের যান্ত্রিক বাহন চালনার বিধি-বিধান অভিযোজন করার মাধ্যমে আধুনিক সমাজের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত ড্রাইভিং আইন প্রণয়ন করা সম্ভব।

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি-বিবেকগত তারতম্যের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে যে মতভিন্নতা দেখা দেয়, তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি নৈপুণ্যের একটি নিদর্শন এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তা ঘটে থাকে। দীনের ব্যবহারিক অনেক বিষয়ে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণের পারস্পরিক মতপার্থক্য তারই একটি অংশ। অবশ্য এ মতপার্থক্যের পিছনে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের পাশাপাশি দলীলের দ্ব্যর্থকতা বা প্রচ্ছন্নতা, তাঁদের দলীল সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও অন্যতম কারণ। উপরন্তু, তাঁদের এ মতভিন্নতা কখনো বাহ্যিক ও শাব্দিক; কখনো তা আমালের স্বরূপ নির্ণয় কেন্দ্রিক, কখনো বা পরস্পর বিরোধীও হয়ে থাকে। সর্বাস্থায় তাঁদের সে মতপার্থক্যে কোনো প্রকারের জিদ্ ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। এর কারণে তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধে সামান্যতমও ব্যত্যয় ঘটাতে পারেনি। এক্ষেত্রে তাঁরা যথার্থ শিষ্টাচার অনুসরণ করতেন। “ফিকহী ইখতিলাফ : স্বরূপ ও শিষ্টাচার” শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্বসূরী ফকীহগণের ইজতিহাদী মতপার্থক্য, তার স্বরূপ, পদ্ধতি ও এ সম্পর্কিত শিষ্টাচার আলোচিত হয়েছে।

বর্তমানে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহ শরীআহভিত্তিক বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুশীলন করে। বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগকৃত অর্থের সিংহভাগ 'বায়উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা' পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। সনাতন মুরাবাহা পদ্ধতি শরীআহসম্মত হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ একমত হলেও 'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে ইসলামী শরীআহ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিদগ্ধ লেখক "ইসলামী ব্যাংকসমূহে চর্চিত 'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা': একটি শরয়ী বিশেষণ" প্রবন্ধে এ সম্পর্কে তার নিজস্ব মত তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা যথাযথ শরীআহ পরিপালন করে অনুশীলন করা হলে তা হালাল ও এর থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশও হালাল। তবে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহকে খুব সতর্কতার সাথে এ পদ্ধতির অনুশীলন করা অপরিহার্য।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা 'নারী অধিকার' নিয়ে সারা পৃথিবী আজ সরব। নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকারের ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সমালোচিত হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মে নারী অধিকারের পরিধির বিষয়টিও। অনেকে অজ্ঞতা ও প্রতিহিংসাবশত ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাদের অভিযোগগুলোর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করার জন্য অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান আলোচনা প্রয়োজন। উক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে "ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ : একটি তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামের পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী ও খ্রিস্ট ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার অংশ নিয়ে আলোচনা করে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে রয়েছে উৎসাহীদের জন্যে পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত যা নারী অধিকারের নামে ইসলামের বিরোধিতাকারীদের ভুল ভাঙতে সহায়তা করবে।

সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার "পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩" শিরোনামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনটি ২৭ অক্টোবর ২০১৩/ ১২ কার্তিক ১৪২০ তারিখ রোববার রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনায় পিতা-মাতা তিলে তিলে নিজের জীবন ও সামর্থ্যকে ক্ষয় করে এক সময় বার্ধক্যে উপনীত হন, কর্মক্ষম হাত পাগুলো নিশ্চল হয়ে পড়ে, ফলে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন সন্তানের উপর। তাই সন্তান যখন সামর্থ্যবান হবে, তখন পিতা-মাতার সার্বিক ভরণ-পোষণ তাদের দায়িত্ব ও আবশ্যকীয় কর্তব্য। ইসলামেও পিতা-মাতার ভরন-পোষণ, সেবা-যত্ন তথা সার্বিক দায়িত্বপালনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য ইসলামে সামগ্রিক বিধি-বিধানের আলোকে উক্ত আইনটি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে "পিতা-মাতার ভরণ-

পোষণ আইন ২০১৩ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। প্রবন্ধকার আইনটির সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেছেন।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। ইসলামী আইনে প্রাণী সম্পর্কেও বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ প্রাণীর বিভিন্ন অধিকার ও প্রাপ্য নির্ধারণ করেছে। প্রাণীর শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্য ভেদে এ সম্পর্কিত বিধানেও ভিন্নতা রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাণীদের অধিকার ও এ সংক্রান্ত বিধিবিধান বিশ্লেষণ করে "প্রাণী হত্যাঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ" প্রবন্ধে প্রাণী পরিচিতি, প্রাণীর অধিকার, কোন্ প্রাণী হত্যা করা বৈধ ও কোন্‌টি নিষিদ্ধ, জিন হত্যা করা, ভুলক্রমে প্রাণী হত্যা ইত্যাদির বিধান তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলাম প্রাণীর অধিকার এবং এ সম্পর্কিত যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। একদিকে ইসলাম প্রাণীকে কষ্ট দেয়া নিষিদ্ধ করে এদের প্রতিপালনের বিস্তারিত বিধান দিয়েছে, অন্যদিকে জনকল্যাণ বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট প্রাণী হত্যা করার অনুমতিও দিয়েছে।

"ইসলামী আইন ও বিচার" জার্নালের এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

শোকবার্তা

"ইসলামী আইন ও বিচার" জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের সম্মানীত সদস্য, আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট টিভি ব্যক্তিত্ব, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগের প্রফেসর ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর গত ১১ মে বুধবার এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা তার রূহের মাগফিরাত ও জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাছি।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন : ২০১৬

ইসলামী শরীআহর আলোকে ড্রাইভিং : একটি পর্যালোচনা

শহীদুল ইসলাম*
নাজিদ সালমান**

Driving in the Light of Islamic Sharī‘ah : an Analysis

ABSTRACT

Vehicle is an imperative part of modern civilization. Driving is an inseparable part of it. A driver plays key role in this regard. A separate department together with relevant laws, called as traffic laws, has been established to control vehicle drivers. Traffic laws of different countries of the world have provisions which clearly describe driver's required qualifications, skill, professionalism and duties. This is because, driving is a job which is directly connected to human life. One of the main objectives of Islamic Sharī‘ah is to protect human lives. For this, Islam has declared necessary rules and regulations to ensure protection and safety of human lives. Islam has set necessary guidelines, principles and laws for driving vehicles in roads, water-vehicles in seas and air-vehicles on airways. It is a crucial demand of time to modify existing traffic laws in the light of relevant provisions in Islam. Against this backdrop, this article presents and discusses views of Islamic Sharī‘ah on vehicle driving, driver's qualifications, duties and responsibilities as well as safe roads, traffic laws, characteristics of vehicles and compensation for road accidents etcetera. The article has been prepared following descriptive and deductive methods. Descriptive method has been applied in discussing relevant Sharī‘ah rules, while deductive method for presenting means of application of related Sharī‘ah rules in this regard. The article facilitates understanding of Sharī‘ah rules related to vehicle driving and necessary outlines for avoiding road accidents.

Keywords: *driving; traffic law; Sharī‘ah & driving; road accidents; driver.*

---

* ডিইডি, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার।
** মুহাদ্দিস, মারকাযুল কুরআন, আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

সারসংক্ষেপ

যানবাহন আধুনিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য অংশ। এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যানবাহন পরিচালনা। ড্রাইভার বা চালক এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাই যানবাহন চালকদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠেছে স্বতন্ত্র বিভাগ ও নিজস্ব আইন, যাকে আমরা ট্রাফিক আইন হিসেবে জানি। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ট্রাফিক আইনে যানবাহন চালক বা ড্রাইভারের যোগ্যতা, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও তার কর্তব্য বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। কেননা বিষয়টি সরাসরি মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামী শরীআহর অন্যতম উদ্দেশ্য হল 'হিফযুন নাফ্স্' (حِفْظُ النَّفْس) বা জীবন সংরক্ষণ। এ কারণে ইসলাম জীবন সংরক্ষণ ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। সড়ক, নৌ ও আকাশ পথে চালিত বিভিন্ন যানবাহন এবং অন্যান্য যান্ত্রিক পরিবহন পরিচালনার ক্ষেত্রেও ইসলাম প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও বিধান নির্ধারণ করেছে। ইসলাম প্রদত্ত এ সব বিধানের আলোকে সমসাময়িক ড্রাইভিং সংক্রান্ত বিধি-বিধান নিরূপণ করা সময়ের অনিবার্য দাবি। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামী শরীয়ার আলোকে যানবাহন ড্রাইভিং, ড্রাইভার বা যান-চালকের যোগ্যতা, দায়িত্ব-কর্তব্য, নিরাপদ সড়ক, ট্রাফিক আইন, যানবাহন তথা গাড়ির বৈশিষ্ট্য এবং দুর্ঘটনার দায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (Descriptive Method) ও অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method) অনুসরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শরয়ী বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি এবং শরীআহ নির্ধারিত বিধানের বাস্তব অনুশীলনের পদ্ধতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে যানবাহন চালনা সংক্রান্ত শরয়ী বিধান অবগত হওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

মূলশব্দ: ড্রাইভিং; ট্রাফিক আইন; শরী'আহ ও ড্রাইভিং; সড়ক দুর্ঘটনা; ড্রাইভার।

ভূমিকা

জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনকে সামনে রেখে এবং যোগাযোগ ও চলাচলের ক্ষেত্রে পুরোনো অনেক পন্থা অচল হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে ইসলামী ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে ড্রাইভিং-এর মত আধুনিক বিষয়ের আলোচনা এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি-বিধান নিরূপণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন কারণে ড্রাইভিং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। বর্তমানে যন্ত্রচালিত বাহন মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এর জনপ্রিয়তা ও সহজলভ্যতার কারণে যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম এখন অচল হতে বসেছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে প্রতিনিয়তই এক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটছে। তবে প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে এর ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে সমান গতিতে। প্রতিদিনই বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও ড্রাইভিং সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট সকল মহল। যার শরয়ী বিধান উদ্ভাবিত হওয়া প্রয়োজন।

ইসলামে মানবতার কল্যাণ ও জীবনঘনিষ্ঠ সব বিষয়ে বিধি-বিধান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষের চলাচল ও জনপথ সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহে নির্দেশনা এসেছে এবং ইসলামী ফিকহের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা বিধৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনায় তাদের চলাচলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

"রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনম্রভাবে চলাচল করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম।"[১]

লুকমান আ. তাঁর পুত্রকে দেয়া উপদেশের মধ্যে চলাচলের পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ উক্ত উপদেশ উল্লেখ করেছেন:

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ - وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. ﴾

"পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যসহকারে বিচরণ করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। চলাচলে সংযত হও এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো, নিশ্চয় গাধার আওয়াজই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর আওয়াজ।"[২]

এ ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ:

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا - كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. ﴾

"ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনই ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনই পর্বত সমান হতে পারবে না; এগুলোর মধ্যে যেগুলো মন্দ সেগুলো তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।"[৩]

মহানবী স. রাস্তার হক ও চলাচলের শিষ্টাচার বর্ণনায় বলেছেন:

إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

"তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। তাঁরা (সাহাবা কিরাম) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কেননা এটাই আমাদের

১. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৩
২. আল-কুরআন, ৩১ : ১৮-১৯
৩. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৭-৩৮

বসার জায়গা, যেখানে আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, বসা ছাড়া তোমাদের যেহেতু গত্যন্তর নেই সেহেতু তোমরা রাস্তার হক আদায় কর। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ, সালামের প্রতিউত্তর, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধাজ্ঞা প্রদান।"[৪]

এই সামগ্রিক নির্দেশনার ভিত্তিতে ইসলামী আইনে ড্রাইভিং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং ফকীহগণ তাদের গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সেগুলো আলোচনা করেছেন।

ড্রাইভিং এর প্রয়োজনীয় উপাদান

ড্রাইভিং এর কয়েকটি প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে। বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে এগুলোর সমন্বিত রূপই ড্রাইভিং। নিম্নে ড্রাইভিং-এর প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হলো:

নিরাপদ সড়ক

নিরাপদ সড়ক ছাড়া ড্রাইভিং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এর অভাবে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের দৃষ্টিতে, রাস্তা সকল মানুষের সম্মিলিত ভোগের বস্তু। সুতরাং প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে রাস্তায় চলাচল করা এবং দাঁড়ানোর। প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে রাস্তা সংশ্লিষ্ট সকল উপকার গ্রহণ করার, তা নিজ জন্তু বা গাড়ির মাধ্যমে হোক। তবে শর্ত হল, যে ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব সে ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়া এবং সে ক্ষতি সংঘটনের আশংকামুক্ত থাকা। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো:

اَلْمُرُوْرُ فِي الطَّرِيْقِ مُبَاحٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ فِيْمَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ

"ক্ষতিসমূহ থেকে যথাসম্ভব নিরাপদে বেঁচে থাকার শর্তে রাস্তায় চলাচল করা বৈধ।"

একাধিক ফকীহ এ শব্দে কায়িদাটি উল্লেখ করেছেন। আর কোন কোন ফকীহ এর মর্মার্থ উল্লেখ করেছেন।[৫] সুতরাং বিষয়ের বিচারে সকল ফকীহ এ কায়িদার ব্যাপারে একমত।

---

৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি' আসসাহীহ* (দামিশক: দারু ইবন কাছীর, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১০হি.), কিতাবুল মাজালিম ওয়াল গাসব, বাবু আফনিয়্যাতুদ দুরি ওয়াজ জুলুস ফীহা, হাদীস নং ২২৯৭; মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ, *আসসহীহ* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৭হি.), কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাহ, বাবুন নাহী আনিজ জুলুস ফীত তারিকাত, হাদীস নং ২১২১

৫. মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার* (কায়রো: মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৬হি.), খ. ৬, পৃ. ৬০২; মুহাম্মদ বিন আহমদ আর-রমালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ* (কায়রো: মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৩৮৬হি.), খ. ৫, পৃ. ৩৪২; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী* (কায়রো: দারুল হিজরাহ, ২য় প্রকাশ,

পূর্বেই রাস্তার হক সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে রাস্তার নিরাপত্তার অপরিহার্যতা ফুটে ওঠে।

নিরাপদ সড়কের ব্যাপারে মহানবী স.-এর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখযোগ্য:

> مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِيْ سَبِيْلٍ مِّنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ فِيْ سُوْقٍ مِّنْ أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
>
> "মুসলমানদের কোন পথে বা কোন বাজারে যদি কেউ কোন জন্তু দাঁড় করিয়ে রাখে, এরপর জন্তুটি যদি সামনের বা পেছনের পা দিয়ে কোন কিছু মাড়ায়, তাহলে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে"[৬]।

এ বিষয়টি মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা-র ধারা ৯৩২-এ স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

> لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه أيضا، فلذلك لا يضمن المار راكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة الذين لا يمكن التحرز عنهما.
>
> "সর্বসাধারণের চলাচলের পথে প্রত্যেকের নিজ জন্তুসহ চলাফেরার অধিকার রয়েছে। এ কারণে চলাচলকারী ব্যক্তি নিজ বাহনে আরোহী অবস্থায় সে ক্ষতি ও দুর্ঘটনার দায়ভার নেবে না, যে ক্ষতি ও দুর্ঘটনা থেকে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না"[৭]।

দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. বলতেন, আমার ধারণা যদি ফুরাতের তীরে কোন ছাগী পথ হারিয়ে মারা যায়, তবে আল্লাহ আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।[৮]

ত্রুটিমুক্ত গাড়ি

নিরাপদ ড্রাইভিং এর জন্য ত্রুটিমুক্ত গাড়ি প্রয়োজন। কেননা গাড়িতে ত্রুটি থাকলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ জন্য ড্রাইভিং এর পূর্বে ভালভাবে গাড়ির ত্রুটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। গাড়ির ত্রুটির কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় ড্রাইভারকে বহন করতে হবে। প্রতিটি দেশের ট্রাফিক আইন ও নির্দেশনায় রাস্তায় চলাচলের উপযুক্ত গাড়ির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়।

১৪১০হি.), খ. ৮, পৃ. ১৬১; আলী হায়দার, *দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতুল আহকাম* (বৈরূত: দারুল জাইল, ১৪১১হি.), খ. ১, পৃ. ৬৩৯, (ধারা ৯৩২)

৬. আলী বিন উমর আদদারাকুতনী, *সুনান আদ্দারাকুতনী* (কায়রো: দারুল মাহাসিন, ১৩৮৬হি.), খ. ৩, পৃ. ১৭৯। এ হাদীছের বর্ণনাকারীদের একজন হল সারিয়্যু বিন ইসমাঈল আল হামদানী। তার বর্ণনা পরিত্যাগযোগ্য। (ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৩, পৃ. ৪৫৯) তবে শরয়ী নীতিমালা এ বিষয়টিকে সমর্থন করে। সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. হায়দার, *দুরারুল হুক্কাম*, খ. ২, পৃ. ৬৩৯; ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার*, খ. ৬, পৃ. ৬০৪; ড. ফাওযী ফয়যুল্লাহ, *নাযারিয়্যাতুয যামান ফীল ফিকহিল ইসলামী* (কুয়েত: দারুত তুরাছ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬হি.), পৃ. ১৭৯

৮. আবূ নু'আইম, *হিলইয়াতুল আউলিয়া* (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৭হি.), খ. ১, পৃ. ৫৩; ইবন সা'দ, *আততাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৩০৫

পূর্ণাঙ্গ ট্রাফিক আইন

একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রাফিক আইন ড্রাইভিং এর মূলভিত্তি। এ আইনের কোন ধারা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর সিদ্ধান্ত (৭৫/২/ঘ:৮):

"সড়ক আইনের যে বিষয়গুলো ইসলামী শরীআহর সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সে বিষয়গুলো মেনে চলা আবশ্যক। কেননা এ আইন মেনে চলা শাসকের সামগ্রিক আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। এর ভিত্তি হল মাসালিহে মুরসালাহ[৯]। এ আইন শরীআহে অপরাধ প্রতিরোধের যে মূল ধারা ও উপধারা রয়েছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। যা জনসাধারণের কল্যাণের বিবেচনায় আইনের এ অধ্যায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব। এর অন্যতম একটি হল আর্থিক দণ্ড। যে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করবে তার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেন সড়ক ও মহাসড়কে যে সব চালক সবাইকে বিপদের মুখোমুখি করে তারা নিবৃত্ত হয়।"[১০]

ড্রাইভিং এর জন্য প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স গ্রহণ এ আইনের একটি অংশ।

ড্রাইভারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী শরী'আহর আলোকে ড্রাইভারের প্রধান দায়িত্ব ট্রাফিক আইন মানা। কেননা সরকার ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণার্থে এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে এ আইন প্রণয়ন করেছে। এ প্রসংগে ট্রাফিক আইন মানা শাসকের নির্দেশ মান্যকরণের আওতাভুক্ত।[১১]

শাসকের অনুসরণের অপরিহার্যতা শরীয়তের উৎস ও বিধিবিধানের মূলসূত্র আল-কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم.﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী।[১২]

---

[৯] মাসালিহ মুরসালাহ বলা হয় ঐসব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকে, যা শারী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার পক্ষে-বিপক্ষে কোনো দলীল নেই। অথচ তা বিবেচনায় এনে কোনো বিধান প্রণয়ন করলে মানুষের কল্যাণ সাধিত অথবা অকল্যাণ দূরীভূত হয়। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামী আইনের উৎস* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩খ্রি.), পৃ. ১৫০

[১০] শাবাব (সাময়িকী), সংখ্যা. ১৩, যুলহিজ্জাহ, ১৪২০ হি.।

[১১] ওহাবাহ আল-যুহাইলী, *আল ফিকহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু* (দামিশক: দারুল ফিকর, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৯হি.), খ. ৬, পৃ. ৭০৪

[১২] আল-কুরআন, ০৪ : ৫৯

কাযী ইবনুল আরাবী (৪৬৮-৫৫৩হি. বলেন, আনুগত্যের সারকথা হল নির্দেশ পালন করা। যেভাবে অবাধ্যতার সারকথা হল নির্দেশ অমান্য করা। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমার মতে আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হল 'উলিল আমর' দ্বারা উদ্দেশ্য শাসকবৃন্দ ও আলিমসমাজ।[১৩]

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আয়াতে আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের আনুগত্যের সাথে উলূল আমরের আনুগত্যের মাঝে গভীর যোগসূত্র রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. এই গভীর যোগসূত্রকে সুস্পষ্ট করেছেন এই বলে:

> من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.
>
> "যে আমার আনুগত্য করবে সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহর অবাধ্য হল। যে শাসকের অনুসরণ করল সে আমার আনুগত্য করল। আর যে শাসকের অবাধ্য হল সে আমার অবাধ্য হল।"[১৪]

অতএব, ড্রাইভারের উচিত, ড্রাইভিং এর সময় ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করা ও যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন থেকে দূরে থাকা। দুটি ক্ষতির একটিকে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির বিষয়টি অবলম্বন করা।

ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা

ট্রাফিক আইন মানার প্রথম দায়িত্বশীল ব্যক্তি হলেন চালক। মানুষের জানমাল রক্ষার্থে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে শাসক যে আইন করেন তা মেনে চলতে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবেন। এর পাশাপাশি এ আইন সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা ও নিরাপদ ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে ট্রাফিক পুলিশের কর্তব্য রয়েছে। আইনটি নিষ্ঠার সাথে প্রয়োগ করা পুলিশের নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য। তিনি মানুষের মাঝে কোন প্রকার বিভেদ ছাড়া, ব্যক্তি পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি ধারণ করে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ইসলামে মুহতাসিবের[১৫]

---

[১৩] ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, সনবিহীন), খ. ১, পৃ. ৪৫১; আবূবকর আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, সনবিহীন), খ. ২, পৃ. ২৬৪; ইবন হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (কায়রোঃ দারুর রাইয়্যান, ২য় প্রকাশ, ১৪০৯হি.), খ. ১৩, পৃ. ১২০

[১৪] ইমাম বুখারী, *আসসাহীহ,* আহকাম অধ্যায়, বাব হাদীস নং (৬৭১৮); মুসলিম, *আসসহীহ,* ইমারাত অধ্যায়, আল্লাহর নাফরমানী না হলে শাসকের আনুগত্য আবশ্যক, হাদীস নং (৪৭২৪)। উল্লিখিত হাদীসের শব্দ সহীহ মুসলিমের।

[১৫] মুহতাসিব (المحتسب) অর্থ হিসবাহ কার্যক্রম পরিচালনাকারী। হিসবাহ বলা হয়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নীতিমালার ভিত্তিতে সমাজে চলমান শরীআহ তথা আইন

ভূমিকার ন্যায়। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়ে লোকদের উপর কোন কষ্ট চাপিয়ে দেবেন না। অপরদিকে নিজ কর্তব্য পালনে কোন শিথিলতা প্রদর্শন করবেন না।

ড্রাইভিং ও সড়ক দুর্ঘটনার দায়

সড়ক দুর্ঘটনার দায় আলোচনার পূর্বে এর কারণ ও ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিশ্লেষণ করা জরুরী বিধায় নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

দুর্ঘটনার কারণ

হৃদয়বিদারক সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ ট্রাফিক আইনের লঙ্ঘন। এ কারণে অনেক মানুষের মৃত্যু ও সম্পদহানি ঘটে। নিম্নে সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ তুলে ধরা হলো:

১. মাত্রাহীন গতি

বাস্তবতা হল, ড্রাইভিং এর গতির একক কোন মাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ রাস্তা প্রশস্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার বিবেচনায়, গাড়ির ভীড় থাকা ও না থাকার বিবেচনায় গতির মাত্রায় পরিবর্তন হয়। বরং এক গাড়ির সাথে অন্য গাড়ির গতির মাত্রায়ও পরিবর্তন হয়। অতএব, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যদি কোন গতির মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হলে সে গতিমাত্রায় গাড়ি চালানো আবশ্যক। আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম স. বলেন:

التَّأَنِّيْ مِنَ اللهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

"ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।"[১৬]

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৬৯১-৭৫১হি.) বলেন:

> إنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب وضع الشئ في غير محله وتجلب الشرور وتمنع الخيور وهي متولدة بين خلقين مذمومين التفريط والاستعجال قبل الوقت.
>
> "তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে হওয়ার কারণ, তাড়াহুড়া হল চঞ্চলতা ও অস্থিরতা, যা ধীরস্থিরতা গাম্ভীর্য ও সহনশীলতার সাথে যে কোন কাজ সম্পন্ন

বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ এবং শরীআহভিত্তিক জীবনযাপনের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ প্রশাসনিক কাঠামোকে। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ রুহুল আমিন, "শরীআ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নীতিমালা ও আল-হিসবাহ: একটি পর্যালোচনা", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৫৫, সংখ্যা ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৫, পৃ. ৩১

[১৬] বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৪. পৃ. ৮৯, হা. নং: ৪৩৬৭; সুয়ূতী আল জামিউস সগীর-এ হাদীসটিকে (৩৩৯০) যয়ীফ বলেছেন। তবে এ হাদীসের সমর্থনে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে এ হাদীসটিকে দুর্বল না হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। এ কারণে শায়খ আলবানী সহীহুল জামিউস সগীর (৩০১১)-এ হাদীসটির উল্লেখ করেছেন।

করতে মানুষকে বাধা দেয় এবং তা যে কোনো বস্তুকে অপাত্রে রাখতে বাধ্য করে। এটি বিভিন্ন ক্ষতি টেনে আনে ও কল্যাণ রোধ করে। এটি মূলত দুটি মন্দ স্বভাবের মিলনে জন্মলাভ করে: অতিমাত্রায় অবহেলা আর সময়ের পূর্বে কোন বিষয়ের তাড়া করা।"[১৭]

খতীব শীরবীনী (মৃ. ৯৭৭হি.) বলেন, কোচোয়ান এমন কাজ করবে না, যা করা তার জন্যে অস্বাভাবিক বলে গণ্য হবে। যেমন কাদার মাঝে তীব্র গতিতে গাড়ি চালানো। ড্রাইভার নিয়মের ব্যত্যয় করার কারণে যদি কারো ক্ষতি হয়, তবে ড্রাইভার ক্ষতিপূরণ দেবে। জনসমাবেশে তীব্র গতিতে গাড়ি হাঁকানো কাদার মাঝে তীব্রগতিতে গাড়ি চালানোর মতই।[১৮]

২. সিগন্যাল অমান্য করা

কোন সন্দেহ নেই, রাস্তায় সিগন্যাল রাখা হয় ক্রসিং পয়েন্টে রাস্তা পরিবর্তন করার সময় গাড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্যেই। এই সিগন্যাল দেখে চালক বুঝবে, কখন সে চলবে আর কখন সে থেমে থাকবে। সিগন্যাল এড়িয়ে যাওয়া ট্রাফিক আইনের মারাত্মক লঙ্ঘন। কারণ সাধারণত সিগন্যাল অমান্য করা হয় অন্যদের চলা শুরু হওয়ার আগে দ্রুত অতিক্রম করার জন্যে। আর এ অবস্থাতে অন্যপাশ থেকে সবুজ সিগন্যাল পাওয়ার কারণে হঠাৎ কেউ বা কোন গাড়ি অতিক্রম করতে চাইলে অন্য পাশের মানুষ বা গাড়ি সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়।

সিগনাল অমান্য করার বিষয়ে শায়খ ইবনু উছাইমীন রহ. বলেন, "সিগন্যাল অমান্য করা জায়েয নেই। শাসকশ্রেণী যদি কোন সংকেত নির্ধারণ করে চালককে থামতে বলে, আর কোন কোন সংকেত চালককে চলতে বলে, তাহলে এই সংকেতগুলো শাসকের পক্ষ থেকে মৌখিক নির্দেশের মত। যেন শাসক তাকে বলছে, চলো বা থেমে যাও। আর শাসকের নির্দেশ মানা আবশ্যক। অন্য লেনগুলো ফাঁকা থাকুক বা অন্য লেনে এমন কেউ থাকুক যার জন্যে লেন ফাঁকা রাখা দরকার, উভয় অবস্থায় বিধান অভিন্ন।[১৯]

৩. অননুমোদিত স্থানে গাড়ি দাঁড় করানো

দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ, অননুমোদিত স্থানে গাড়ি দাঁড় করানো, যার ফলে চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয় অথবা অন্যের উপকার নষ্ট হয় অথবা কোন গাড়ির সামনে দাঁড়ানো,

---

[১৭] আব্দুর রউফ আল-মানাভী, *ফায়যুল কাদীর* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ২য় প্রকাশ, ১৩৯১হি.), খ. ৩, পৃ. ২৭৭

[১৮] মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ খতীব শীরবীনী, *মুগনী আল মুহতাজ* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৪১৮হি.), খ. ৪, পৃ. ২৭০-২৭১

[১৯] ইবনু উছাইমীন, *ফাতাওয়া ও তাওজীহাত ফীল ইজাযাতি ওয়ার রিহলাত*, পৃ. ৮০

যার ফলে অন্য গাড়িটি বের হতে হলে তার সরে যাওয়ার অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। নি:সন্দেহে এমনটি করা বিধেয় নয়। পরিস্থিতি, বাস্তবতা ও কষ্টের বিবেচনায় এ আচরণের গোনাহে পার্থক্য হবে।

এ প্রসংগে লক্ষণীয়, হজ্জের সময়ে ভীড়ে অন্যদের কষ্ট না দেয়ার দিকে খেয়াল করে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন না করে দূর থেকে ইশারা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ বাইতুল্লাহ তাওয়াফের সুন্নত আমল এই চুম্বন। সুতরাং কোন অননুমোদিত বিষয়ে কীভাবে অন্যকে কষ্ট দেয়া জায়েয হতে পারে?

৪. অন্যান্য কারণ

দুর্ঘটনা ঘটার এছাড়া আরো কারণ রয়েছে, যেগুলো থেকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যেমন তন্দ্রা, খেলনার ছলে[২০] অবহেলার সাথে গাড়ি চালানো এবং গাড়ির ফিটনেসের প্রতি যত্ন না নেয়া, বিশেষত গাড়ির ব্রেক ইত্যাদি। এ সবগুলোর প্রত্যেকটিই নির্মম দুর্ঘটনা ঘটার কারণ হয়ে থাকে, যার ফলে বিপুল জানমালের ক্ষতি হয়। এ কারণগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকা চালকের কর্তব্য। এগুলো এড়িয়ে না চললে এর দায় ও গোনাহ চালককেই বহন করতে হবে, যেহেতু তার অবহেলা ও অমনোযোগিতার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ক্ষতির দায় বহন

ড্রাইভিং থেকে সৃষ্ট সড়ক দুর্ঘটনার দায় বহন সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যের ক্ষতি করার বিধান ও এ বিষয়ক মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾

"আর আমি বনী আদমকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে উত্তম রিয্ক দিয়েছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি এমন অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি"।[২১]

এ আয়াতে বর্ণিত মানুষকে সম্মানিত করার অর্থ হলো, মানুষের জন্যে আল্লাহ এমন বিধান দিয়েছেন, যা তার জীবন ও প্রাণ রক্ষা করবে। পাশাপাশি তার সম্পদ রক্ষা

---

২০. এর আরবী পরিভাষা তাফহীত (تفحيط)। এটি নবআবিস্কৃত বহুলপ্রচলিত একটি শব্দ। এর অর্থ গাড়িকে অবহেলা ভরে চালানো, যা বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন কোন কোন যুবক করে থাকে। ইঞ্জিনে এমনভাবে চাপ দিয়ে রাখে, যে কারণে গাড়ি দ্রুতগতিতে চলতে থাকে, আর গতি থাকে এ পর্যায়ে যে, সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে তা থেকে কর্কশ আওয়াজ বের হয় এবং মাটির সাথে তীব্রভাবে ঘর্ষণ খায় ও এটি তীব্রগতিতে অন্যান্য গাড়ির দিকে ছুটে যেতে থাকে।

২১. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

করবে, যেহেতু সম্পদ মানুষের জীবন নির্বাহের মাধ্যম। তদ্রূপ জীবন ও সম্পদে যে কোন অন্যায় হস্তক্ষেপকে অপরাধরূপে গণ্য করেছেন, যা আখেরাতে শাস্তি আর দুনিয়াতেও বিভিন্নপ্রকার সাজা ও ক্ষতিপূরণ আবশ্যক করে।[২২]

এমন কোন প্রাণ বা সম্পদ নেই, ইসলামে যার কোন মূল্য নেই বা যা নষ্ট হলে কারো কোন দায় নেই এবং কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ কারণেই এ দুটি বিষয়ের সংরক্ষণকে ইসলাম মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেগুলো সংরক্ষণ শরীআহর উদ্দেশ্য তথা মাকাসিদুশ শরীআহ হিসেবে গণ্য।[২৩] ক্ষতির বিনিময় প্রদানের আওতায় প্রাণহানির ক্ষতির বিনিময়ও অন্তর্ভুক্ত। যার কিছু নির্ধারিত যেমন দিয়াত (প্রাণহানির ক্ষতিপূরণ), কিছু অনির্ধারিত যেমন আরশ[২৪] (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতিপূরণ)। এ ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর বদলা যা হবে তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

সুতরাং অন্যের জানমালে যে কোন ক্ষতি সাধন হারাম ও তার ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়া কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নস দ্বারা সাব্যস্ত দীনের একটি মূলনীতি। হাদীস ও ফিকহের ইমামগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, শরীআহে মানুষের জানমাল সম্মানিত। মানুষের জানমালের ক্ষেত্রে মূলবিধান হল এগুলোর ক্ষতি সাধন নিষিদ্ধ। আর ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ ছাড়া কারো প্রাণ ও সম্পদ অন্যের জন্যে হালাল নয়।[২৬]

এ সম্পর্কিত কিছু ফিকহী মূলনীতি ও তার ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ "কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারও ক্ষতির অনুরূপ বদলাও গ্রহণ করা যাবে না"[২৭] মূলনীতিতে বর্ণিত শব্দদুটির মধ্যে অর্থগত ব্যবধান কী তা নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ضرر অর্থ "অন্যের ক্ষতি করা" আর ضرار (যের দিয়ে) অর্থও অন্যের ক্ষতি করা। সুতরাং দ্বিতীয় শব্দ প্রথম শব্দকে

---

[২২] ড. আব্দুল আযীয উমর আল-খতীব, "মাসউলিয়্যাতু সাই'কিস সাইয়্যারা ফী দুইল ফিকহিল ইসলামী", *মাজাল্লাতু আল-আদল*, আইন মন্ত্রণালয়, সৌদী আরব, সংখ্যা ৩২, রজব ১৪২৭ হি., পৃ. ১৫৩

[২৩] আশশাতিবী, *আল মুওয়াফাকাত* (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৬খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০

[২৪] أُرُوش শব্দটি أَرْش-এর বহুবচন। অর্থ: জখমের দিয়্যাত। (আহমদ আল-ফাইয়ূমী, *আল মিসবাহুল মুনীর* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪হি.), মাদ্দা: আরশ)

[২৫] ফায়যুল্লাহ, *নাযারিয়্যাতুয যামান*, পৃ. ১৪

[২৬] ইবন কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ৭, পৃ. ৩৬০, ও খ. ১১, পৃ. ৪৪৩; আবু আবদুর রহমান দিমাশকী, *রহমাতুল উম্মাহ ফী ইখতিলাফিল আইম্মা* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭হি.), পৃ. ১৭৩

[২৭] এ মূলনীতিটি একটি হাদীছে উদ্ধৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাযাহ, *আসসুনান* (ইস্তাম্বুল: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, সনবিহীন), বাবু মান বানা ফী হাক্কিহি মা ইয়াদুররু বিজারিহি, খ. ২, পৃ. ৭৮৪, হাদীস নং ২৩৪০ ও ২৩৪১

কেবল অর্থগত দৃঢ়তা দান করছে। তবে এ বিষয়ক মতসমূহের মধ্যে উত্তম মত হলো, ضرر অর্থ অন্যের যে কোন ক্ষতিসাধন। আর ضرار অর্থ প্রতিশোধ ও বদলা হিসেবে অন্যের ক্ষতিসাধন।[২৮]

এ মূলনীতি ইঙ্গিত করে, কোন ক্ষতির বদলা হিসেবে অনুরূপ ক্ষতিসাধন শরীআহর দৃষ্টিতে কাম্য নয়। (তবে কিসাস বা এ জাতীয় বিধান এই মূলনীতির আওতাভুক্ত নয়।) বরং যার ক্ষতি হয়েছে তার কর্তব্য হল ক্ষমা করা অথবা ক্ষতির বিনিময় গ্রহণ করা। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো গাড়ি যদি অন্যের গাড়ির ক্ষতিসাধন করে সে অবস্থায় অপর গাড়িকে আঘাত করার অধিকার এ গাড়ির মালিকের নেই। বরং তার কর্তব্য হল ক্ষমা করা অথবা নিজ গাড়ি আগের অবস্থায় চলে আসা পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

ফকীহদের সর্বসম্মতিক্রমে এ মূলনীতি এমন সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে শরীআহ ক্ষতির বদলা হিসেবে ক্ষতি করার অনুমতি দেয়নি। সুতরাং কিসাস, হদ্দ ও তাযীর এ মূলনীতির আওতাভুক্ত নয়। এগুলোতে যদিও বাহ্যিক ক্ষতি রয়েছে; কিন্তু সমাজের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে ও জানমালের অধিকার রক্ষার্থে এগুলোকে কার্যকর করাই শরীআহর কাম্য। তাছাড়া উপকার সাধনের তুলনায় ক্ষতিরোধ করার বিষয়টি অগ্রগণ্য। উপরন্তু, ক্ষতিরোধ করার স্বার্থেই শরীআহ দণ্ডগুলো অনুমোদন করেছে।[২৯]

২. اَلضَّرَرُ يُزَالُ "ক্ষতি দূর করা আবশ্যক।"[৩০]

এটি অতীব তাৎপর্যবহুল একটি মূলনীতি। কেননা ফিকহের এমন প্রতিটি অধ্যায়েই এটি প্রযোজ্য, যেখানে নিশ্চিত বা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ক্ষতি দূর করার বিষয় রয়েছে। এ মূলনীতি অনুসারে সে ক্ষতি দূর করা এবং ক্ষতি হয়ে গেলে ক্ষতির প্রভাব দূর করে বস্তুকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা আবশ্যক। যেমন সর্বসাধারণের চলার পথে যদি কেউ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখে, যার কারণে চলমান গাড়ি অথবা চলাচলকারী পথিকের কষ্ট হয়, তবে দুর্ঘটনার আশংকা দূর করার নিমিত্তে গাড়ি দাঁড় করে রাখার অনুমতি দেয়া হবে না।

---

২৮. ইবনুল আছীর, *আন নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, সনবিহীন), খ. ৩, পৃ. ৮১; ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১৪১০হি.) খ. ..., পৃ. ...; মাদ্দাহ (*যারার*)।

২৯. শায়খ আহমদ যারকা, *শরহুল কাওয়াঈদিল ফিকহিয়্যাহ* (বৈরূতঃ দারুল গারব আল-ইসলামী, ১৪০৩হি.), পৃ. ১১৩

৩০. আবদুর রহমান আসসুয়ূতী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর ফী ফুরুয়িশ শাফিঈয়্যাহ* (কায়রোঃ মাকতাবাতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৭৮হি.), পৃ. ৮৩; ইবনু নুজাইম, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর* (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১০৫

এ থেকে ফকীহগণ বলেছেন, সর্বসাধারণের চলার পথের দিকে যদি কেউ বৃষ্টির নালা উন্মুক্ত করে রাখে অথবা পথের অন্যায় ব্যবহার করে উঁচু কোন স্থান নির্মাণ করে, যার ফলে পথচারীদের চলতে কষ্ট হয়, তাহলে বৃষ্টির নালা বা উঁচু স্থান নির্মাণের অনুমতি দেয়া হবে না। আর যদি নির্মাণ করে ফেলে তাহলে অন্যদের ক্ষতি রোধ করার স্বার্থে নির্মিত উঁচু স্থান বা নালা ভেঙ্গে ফেলা হবে। বরং এই নির্মাণের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে।[৩১]

ব্যক্তিগত অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ মূলনীতি প্রয়োগের নমুনা হলো, যদি কেউ গাড়ি দিয়ে কোন মানুষ বা বস্তুকে আঘাত করে যার ফলে কোন প্রাণ বা সম্পদের ক্ষতি হয়, তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা এ ক্ষতির প্রভাব দূর করে তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আবশ্যক। বদলা দেয়া ছাড়া ক্ষতি দূর করা সম্ভব নয়। ইসলামী ফিকহে কারো ক্ষতিসাধন সে তিন কারণের একটি, যেগুলোর কারণে ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক হয়।[৩২]

৩. الْمُرُوْرُ فِي الطَّرِيْقِ مُبَاحٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ فِيْمَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ عَنْهُ : রাস্তায় চলাচল করা বৈধ, শর্ত হল যে ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব সেগুলো সংঘটনের আশংকামুক্ত থাকা। একাধিক ফকীহ এ শব্দে এ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

৪. المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا "ক্ষতির সরাসরি সংঘটক দায় বহন করবে, যদিও সে অন্যায় না করে" কাছাকাছি শব্দে ফকীহগণ এ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তবে মূল বিষয়ে সকল ফকীহ একমত।[৩৩]

এ মূলনীতির সমর্থনে মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা-র ৯২ নং ধারায় বলা হয়েছে: اَلْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ، وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ক্ষতিকারক ক্ষতিপূরণ দেবে, যদিও সে অন্যায় না করে। এখানে تَعَمُّد শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য تَعَدِّيْ অন্যায় ব্যবহার। এ ব্যাখ্যা করার কারণ হল, সম্পদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছা-অনিচ্ছা সমান। পার্থক্য এই যে, অনিচ্ছায় ক্ষতি করলে এর কারণে গোনাহ হবে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে উভয় অবস্থা সমান। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তিনজনকে বাগান খনন করার জন্যে মজদুর নিয়োগ

---

[৩১] ইবনুল আবিদীন, *আদ দুররুল মুখতার*, খ. ৬, পৃ. ৫৯২; মুহাম্মদ বিন উরফাহ আদ দাসূকী, *হাশীআহ আলা আশ শারহুল কাবীর* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭হি.), খ. ৫, পৃ. ৩৫; রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৭, পৃ. ৩৫৭; ইবন কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৯৮

[৩২] হায়দার, *দুরারুল হুক্কাম*, খ. ১, পৃ. ৩৭; ফায়যুল্লাহ, *নাযারিয়্যাতুয যামান*, পৃ. ১৯।

[৩৩] ইবনু আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার*, খ. ৬, পৃ. ৬০৩; শিহাবুদ্দীন আহমাদ আল-ক্বারাফী, *আয যাখীরা* (বৈরূতঃ দারুল গারব আল-ইসলামী, ১৯৯৪খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৫৯; যারকা, *শরহুল কাওয়াঈদিল ফিকহিয়্যাহ*, পৃ. ৩৮৫

করল। তখন তারা একসাথে দেয়ালের মূলভিতে আঘাত করল। এরপর দেয়াল ধ্বসে তাদের একজন মারা গেল। তারা কাযী শুরাইহ[৩৪]-এর দরবারে মোকাদ্দমা নিয়ে গেল। তিনি অবশিষ্ট দু'জনের দায়ে এক তৃতীয়াংশ করে দিয়াত ধার্য করলেন।[৩৫]

সুতরাং জন্তু বা বাহনের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি সাধনকারী নিঃশর্তভাবে ক্ষতিপূরণ বহন করবেন। ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করুক বা অনিচ্ছায়, অন্যায়ভাবে চালাক বা যথাযথভাবে চালনা করুক- বিধান অভিন্ন। সুতরাং কেউ যদি কোন জন্তু বা বাহনের পিঠে বিভিন্ন জিনিস বোঝাই করে সর্বসাধারণের বাজার অতিক্রম করে, সে সময় পিঠ থেকে কোন কিছু পড়ে কারো প্রাণহানি ঘটে বা কারো কোন সম্পদ নষ্ট হয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা সে ক্ষতির সংঘটক আর ক্ষতির সংঘটক ক্ষতির দায়ভার বহন করে। যদি রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় বাহনের চাকা খুলে যায়, এরপর কাউকে বা কোন বস্তুতে আঘাত করে তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা চাকা খুলে যাওয়া প্রমাণ করে, চালক মজবুতভাবে চাকা লাগায়নি। তাছাড়া সে ক্ষতির সংঘটক। আর সংঘটক নিঃশর্তভাবে ক্ষতিপূরণ বহন করে[৩৬]।

সরাসরি ক্ষতি সংঘটন ও সংঘটনের কারণ

ফকীহগণ সরাসরি সংঘটনের অর্থ এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, যে কাজ ও ক্ষতির মধ্যে অন্য কারো ইচ্ছাকৃত কোন কাজ সংঘটিত হয় না।[৩৭] যদি ব্যক্তির কাজ ও ক্ষতি সংঘটনের মাঝে অন্য কারো কাজ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে বলা যাবে না। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি তখন ক্ষতির দায় বহন করবে না।

---

৩৪. নাম আবু উমাইয়্যা, শুরাইহ বিন হারিস বিন কায়স আল কিন্দী। পূর্বপুরুষ ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত। ইসলামের প্রসিদ্ধ কাযীদের অন্যতম। ওমর, ওসমান, আলী ও মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে পঁচাত্তর বছর মেয়াদে কুফার বিচারক ছিলেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। বিচারক হিসেবে দোষমুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং আটাশি হিজরীতে কুফায় মৃত্যুবরণ করেন। (আবু নুআইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৩২; ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব* (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, সনবিহীন), খ. ১, পৃ. ৮৫

৩৫. ইবনু আবী শায়বা, *আল মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আছার* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৪৭, হা. নং: ২৭৮৬৬

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ ثَلاَثَةً يَحْفِرُونَ لَهُ حَائِطًا، فَضَرَبُوا فِي أَصْلِهِ جَمِيعًا، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَضَى عَلَى الْبَاقِيَيْنِ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ.

৩৬. ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার*, খ. ৬, পৃ. ৬০৩; ফায়যুল্লাহ, *নাযারিয়্যাতুয যামান*, পৃ. ১৮৪

৩৭. আল-হামুভী, *গামযু উয়ূনিল বাছাইর* [ইবনু নুজাইম কৃত আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর-এর ভাষ্যগ্রন্থ], (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৬৬; ক্বালয়ূবী ও আমীরা, *আলা শরহুল মিনহাজ*, খ. ২, পৃ. ২৮ ও খ. ৪, পৃ. ৯৮; শায়খ মুস্তফা আহমদ যারকা, *আল মাদখালুল ফিকহিয়্যল আম*, (দামিশক : দারুল ফিকর, ১৯৬৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৪৪

এর উদাহরণ হল, একজন গাড়ি চালিয়ে কারো গায়ে ঘষা দিলে লোক একপাশে পড়ে গেল। আরেকটি গাড়ি এসে তাকে পিষ্ট করলে লোকটি মারা গেল, এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তির উপর হত্যার দায় বর্তাবে না বরং দ্বিতীয়জনের উপর হত্যার দায়ভার বর্তাবে। অথচ প্রথমজন এখানে হত্যার কার্যকারণ ঘটিয়েছে। কিন্তু ফকীহগণ বলেন, যখন কোন দুর্ঘটনায় দুজন একত্রিত হয়, যার একজন সরাসরি দুর্ঘটনা সংঘটন করে আর অপরজন ক্ষতি সংঘটনের কারণ হয়, তখন দুর্ঘটনার বিধান (অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ) আরোপিত হবে যে ক্ষতি সংঘটন করেছে তার উপর। ক্ষতি সংঘটন ও ক্ষতির কারণের মাঝে পার্থক্য করা হলে ক্ষতি সংঘটনের ক্ষেত্রে কারণের কোন ভূমিকা থাকে না, যেমনটা আমরা উদাহরণে আলোচনা করেছি।

ক্ষতি সংঘটকের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফ (প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন) হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং যদি চালক অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় আর সে কোন প্রাণহানি ঘটায় বা সম্পদের ক্ষতি করে, তাহলে সে যা ক্ষতি করেছে তার দায় বহন করবে। কেননা ক্ষতির দায় বহন করার ক্ষেত্রে দায় বহন করার যোগ্যতা শর্ত নয়। বরং ক্ষতির দায় বহন করার জন্যে তার বদলা আবশ্যক হওয়ার উপযোগিতা থাকাই যথেষ্ট।[৩৮] যুহরী ও কাতাদা রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ইচ্ছাকৃত হত্যার প্রতিবিধান হল দিয়্যাত (রক্তমূল্য)।[৩৯] অর্থাৎ তাদের থেকে কিসাস (জীবনের বিপরীতে জীবন) আদায় করা হবে না। বরং ভুলবশতকৃত হত্যার ন্যায় তাদের থেকে দিয়্যাত নেয়া হবে।

তবে বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতিকে গভীরভাবে বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণ করা উচিত যে, দুর্ঘটনা কারো সরাসরি হস্তক্ষেপে ঘটেছে, না কোনো কারণবশত।

এ বিষয়ে ফকীহদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়:

হানাফী মাযহাবের ফকীহ 'আলাউদ্দীন আলকাসানী [মৃ. ৫৮৭ হি.] রহ. বলেন, জন্তু যদি কোচোয়ানের হাত থেকে পালিয়ে যায় বা ছুটে যায়, তাহলে সে মুহূর্তে জন্তু যা ক্ষতি করবে, কোচোয়ান তার দায় বহন করবে না। এর দলিল হল, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَار -"পশুর আঘাত বিনিময়শূন্য।"[৪০] তাছাড়া জন্তু

---

৩৮. যারকা, *আল মাদখালুল ফিকহীয়্যল 'আম*, খ. ২, পৃ. ৭৪৪

৩৯. আব্দুর রাযযাক আস সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ* (করাচী: আল-মাজলিসুল ইলমী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৬হি.), খ. ১০, পৃ. ৭০, হাদীছ নং ১৮৩৯১

عن الزهري قال مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ قال معمر وقاله قتادة أيضا

৪০. এটি মুহাদ্দিসগণের নিকট অতিপ্রসিদ্ধ একটি হাদীস। সিহাহ সিত্তাসহ অধিকাংশ মৌলিক হাদীস সংকলনে হাদীসটি বিধৃত হয়েছে। (ইমাম বুখারী, *আল-জামি' আসসাহীহ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফীর রিকাযি আল-খুমুস, খ. ২, পৃ. ৫৪৫, হাদীস নং ১৪২৮)

হাতছাড়া হওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোচোয়ানের কোন ভূমিকা নেই। জন্তুকে অন্যের ক্ষতি করা থেকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও কোচোয়ানের নেই। সুতরাং এ জন্তুর কারণে সংঘটিত ক্ষতির কারণে কেউ দায়বদ্ধ নয়।[৪১]

মালিকী মাযহাবের ইমাম শিহাবুদ্দীন আহমাদ আল-কারাফী [৬২৬-৬৮৪ হি.] রহ. বলেন, জন্তু যদি আরোহীকে নিয়ে দৌড় দেয়, আরোহী যদি মনে করে এমতাবস্থায় জন্তুকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে সে উল্টে যাবে, তাহলে জন্তু যা ক্ষতি করবে আরোহী তার দায় বহন করবে। কেননা তার আরোহণের কারণেই ক্ষতি হয়েছে।[৪২]

শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আর-রামালী রহ. [৯১৯-১০০৪ হি.] রহ. বলেন, আরোহী যদি সাধারণত জন্তুকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়; কিন্তু আচমকা ঘটে যাওয়া কোন কারণে হঠাৎ জন্তু তার আওতার বাইরে চলে যায়, যেমন মজবুত রশি ছিঁড়ে গেল, এরপর জন্তুর কারণে যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলে আরোহী দায় বহন করবে না। অধিকাংশ ফকীহই এ মত পোষণ করেন।[৪৩] তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, কোচোয়ান দায় বহন করবে।[৪৪]

হাম্বলী ফকীহ শামসুদ্দীন ইবনু মুফলিহ [৭০৮-৭৬৩ হি.] রহ. বলেন, কোচোয়ানের কোন ত্রুটি ছাড়া জন্তু যদি কোচোয়ানের আওতার বাইরে চলে যায়, তাহলে কোচোয়ান দায়বদ্ধ থাকবে না।[৪৫]

মোটকথা, এ বিষয়ে ফকীহদের মাঝে দুটি ভাগ রয়েছে।

১. হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে, সে ক্ষতিপূরণ বহন করবে না। যেহেতু কার্যত ক্ষতির সংঘটন তার পক্ষ থেকে হয়নি, যেহেতু তার ইচ্ছা এখানে অনুপস্থিত।

২. মালিকী ও শাফিয়ী ফকীহদের মতে, ব্যক্তি ক্ষতির দায় বহন করবে। কেননা, কার্যত সে-ই ক্ষতির সংঘটক। জন্তুর দৌড় দেয়ার বিষয়টি ক্ষতিপূরণ রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব রাখে বলে তাঁরা মনে করেন না।

আধুনিক অনেক ফকীহ মনে করেন, যদি নাগালের বাইরে চলে যাওয়া বা নিয়ন্ত্রণহীন হওয়া জন্তুর স্বভাব ও অভ্যাস আরোহীর জানা থাকে, তাহলে অবশ্যই সে ক্ষতিপূরণ

---

৪১. আবূ বকর ইবন মাস'উদ আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাইঈ* ফী তারতীবিশ শারাঈ' (বৈরূত: দারুল কিতাব, ২য় সংস্করণ, ১৪০২হি.), খ. ৭, পৃ. ২৭৩

৪২. আল-কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৬

৪৩. এ মতটি হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মতের অনুরূপ।

৪৪. রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯; আব্দুল কারীম আর-রাফীঈ, *আল 'আযীয শরহুল ওয়াজীয* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭হি.), খ. ১১, পৃ. ৩৩১

৪৫. মুহাম্মদ ইবন মুফলিহ, *আল ফুরূ'* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৬; মানসূর আল-বাহূতী, *শরহু মুনতাহাল ইরাদাত* (বৈরূত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ২০০০খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৮১

দেবে। যেহেতু আরোহণ করে সে ভুল করেছে এবং জন্তুকে ক্ষতি সাধনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু যদি ক্ষতি করা জন্তুর স্বভাব বা অভ্যাস না হয়; বরং তা হঠাৎ কোন কিছু থেকে ভয় পাওয়ার কারণে উদ্ভূত আচরণ হয়, তবে সে ক্ষতিপূরণ বহন করবে না।[৪৬]

মোদ্দাকথা হলো, কোন অবস্থাতেই গাড়ির ব্রেক ছুটে গেলে সেটাকে জন্তুর উপর কিয়াস করা যায় না। বস্তুত বিষয়টি উল্লিখিত বিধান ও মতপার্থক্যের আওতায় আনা সমীচীন নয়। বরং বলা যায়, এক্ষেত্রেও চালক ক্ষতিপূরণ বহন করবে। কেননা ব্রেক ছুটে যাওয়া প্রমাণ করে, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে তার ত্রুটি রয়েছে। গাড়ির এক্ষেত্রে কোন এখতিয়ার নেই। কেননা গাড়ির নিজস্ব কোন শক্তি নেই। বিপরীতে জন্তুর নিজস্ব শক্তি রয়েছে, যার কারণে সে কখনো কখনো আরোহীকে পরাস্ত করে ফেলে।

অন্যদিকে, যদি আরোহীর পক্ষ থেকে ক্ষতি সংঘটিত না হয়ে অন্য কোন কারণে ক্ষতি হয়, তাহলে আরোহী ক্ষতিপূরণ দেবে না। বরং যে ব্যক্তি ক্ষতি সংঘটনের কারণ হয়েছে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা ক্ষতির সরাসরি সংঘটন তার পক্ষ থেকেই হয়েছে।

বিষয়টি স্পষ্ট ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনে নিম্নে কতীপয় ফকীহের বক্তব্য উল্লেখ করা হলো:

ইমাম মুহাম্মদ [১৩১-১৮৯ হি.] রহ. বলেন, "যদি কেউ কোন জন্তুর পিঠে সওয়ার হয়, আরেকজন সেই জন্তুকে খোঁচা বা আঘাত করার কারণে জন্তু খুর বা শিং দিয়ে আঘাত করে কাউকে মেরে ফেলে, তাহলে এর দায় বহন করবে খোঁচা দেয়া ব্যক্তি; আরোহী নয়। আর যদি খুর বা শিং দিয়ে আঘাত করে খোঁচা দেয়া ব্যক্তিকে মেরে ফেলে, তাহলে তা হবে বিনিময়শূন্য। আর যদি খোঁচার কারণে আরোহীকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলে, তাহলে খোঁচা দেয়া ব্যক্তি দিয়্যাত বহন করবে। যদি খোঁচার কারণে লাফ দিয়ে কারো উপর পড়ে তাকে মেরে ফেলে অথবা কাউকে পিষ্ট করে মেরে ফেলে, তাহলে এর দায় বহন করবে খোঁচা দেয়া ব্যক্তি; আরোহী নয়।"[৪৭]

অন্য তিন মাযহাবের ইমামগণও অনুরূপ মত দিয়েছেন।[৪৮]

---

[৪৬] মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *বুহূসুন ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাতিন মু'আসিরা* (বৈরূত: দারুল কলম, ১৪১৯ হি.), খ. ১, পৃ. ২৯৯

[৪৭] ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শায়বানী, *আল আসল (আল মাবসূত)*, বিশ্লেষণ: আবূল ওয়াফা আল-আফগানী (বৈরূত: আলামুল কুতুব, সনবিহীন), খ. ৪, পৃ. ৫০১; দ্রষ্টব্য: হাসান বিন মানসূর আল-ফারগানী, *আল ফাতাওয়াহ আল-হিন্দিয়্যাহ* (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ৪র্থ প্রকাশ, সনবিহীন), খ. ৬, পৃ. ৫১

[৪৮] কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৫; রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৫৪৪

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, ক্ষতি সংঘটনের কারণ যে ঘটিয়েছে ফকীহদের ঐকমত্যে তার উপরই ক্ষতিপূরণের দায় বর্তাবে। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি কাদিসিয়া থেকে একটি বালিকাকে নিয়ে আসছিল। পথে সে আরোহী এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। লোকটি জন্তুকে খোঁচা দিল। ফলে জন্তু পা তুলে বালিকাটির চোখে আঘাত করল। এ মোকাদ্দমা সালমান বিন রাবী'আ আল-বাহিলীর আদালতে গেলে তিনি বললেন, আরোহী ক্ষতিপূরণ দেবে। ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে এ ফয়সালার সংবাদ গেলে তিনি বললেন, এর দায়ভার খোঁচা দানকারী ব্যক্তিটির ওপর বর্তাবে। সে-ই ক্ষতির দায় বহন করবে।[৪৯]

ফকীহগণ এটাও বলেছেন যে, জন্তু মারা যাওয়ার কারণে যদি আরোহী পড়ে যায় এবং অন্যের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে আরোহী সে দায় বহন করবে না। একইভাবে মৃত্যু বা অন্য কোন রোগবশত আরোহী যদি জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে যেয়ে কোন কিছু নষ্ট করে, তাহলে আরোহী তার দায় বহন করবে না। যেহেতু অন্যের ক্ষতি বা সম্পদ নষ্টের বিষয়টি তার পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে- একথা বলার সুযোগ আমাদের নেই।

শাফিয়ী মাযহাবের ইমাম আবুল কাসিম আররাফিয়ী [৫৫৭-৬২৩ হি.] রহ. বলেন, "কেউ যদি জন্তুতে আরোহণ করে এরপর জন্তু মরে পড়ে যায় ও কোন ক্ষতি ঘটায়[৫০], অথবা আরোহী মারা যায় এবং পড়ে গিয়ে কোন ক্ষতি ঘটায় তাহলে সে ক্ষতির দায় বহন করবে না"।[৫১]

ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, যদি দুই আরোহীর মাঝে সংঘর্ষ এভাবে হয় যে, কেউ আরেকজনের আগে আঘাত করতে পারেনি, অর্থাৎ প্রত্যেকেই অপরের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের শিকার হয়েছে, এরপর উভয়েই ঘোড়াসহ মারা গিয়েছে, তাহলে প্রত্যেকের আকিলা[৫২] অপরের আকিলাকে অর্ধেক দিয়্যাত দেবে। এর কারণ,

---

[৪৯] ইবনু আবী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৫, পৃ. ৪৫৬, (২৭৯৪৯); ইবনু 'আবদির রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৯, পৃ. ৪২২ (১৭৮৭১১)

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّةٍ، فَنَخَسَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ، فَرَفَعَتِ الدَّابَّةُ رِجْلَهَا، فَلَمْ تُخْطِئْ عَيْنَ الْجَارِيَةِ، فَرُفِعَ إِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَضَمَّنَ الرَّاكِبَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: عَلَيَّ الرَّجُلِ، إِنَّمَا يُضَمَّنُ النَّاخِسُ.

[৫০] অনুরূপ বিধান প্রচণ্ড বাতাস বা অসুস্থতা বা এজাতীয় এমন যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য প্রযোজ্য হবে, যার কারণে আরোহী বা জন্তু নিজ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

[৫১] রাফিয়ী, *আল 'আযীয শরহুল ওয়াজীয*, খ. ১১, পৃ. ৩৩৬

[৫২] আকিলা শব্দটি উহ্য মাওসূফ (বিশেষণযুক্ত পদ) এর গুণ, এর পূর্ণাঙ্গ রূপ: الجماعة العاقلة (দিয়্যাত দানকারী দল), পরিভাষায় আকিলা বলা হয় যৌথ দায়ভার বহনকারী কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষকে, যা তার অধীনস্ত সদস্যগণের মাধ্যমে হওয়া অনিচ্ছাকৃত হত্যার রক্তপণ প্রদান করে।

প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটেছে নিজের ও অন্যের অন্যায় আচরণের কারণে। নিজের অন্যায়ের কারণে দিয়্যাত অর্ধেক রহিত হয়ে যাবে এবং অন্যের অন্যায়ের কারণটি ধর্তব্য হবে এবং অর্ধেক দিয়্যাত দেয়া হবে।

অনুরূপভাবে আরোহী ও অপরের অন্যায় আচরণের কারণে যদি প্রত্যেকের ঘোড়া মারা গিয়ে থাকে। অন্যের অপরাধকে বিবেচনা করে ঘোড়ার অর্ধেক মূল্য দিতে হবে। তবে এ মূল্য দেয়া হবে অপর আরোহীর নিজস্ব সম্পদ থেকে; আকিলার তরফ থেকে নয়।[৫৩]

দুই আরোহী বা জাহাজের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তার বিধানও একই হবে। অনুরূপ দুই গাড়ির মাঝে সংঘর্ষ হলেও একই বিধান হবে ।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, "দুই ঘোড়া আরোহীর মাঝে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে প্রত্যেকে মারা গেলে প্রত্যেকের সম্পদ থেকে অপরকে দিয়্যাত দেয়া হবে।"[৫৪] মালিকী ও হাম্বলী ফকীহদের মত অনুরূপই।[৫৫]

ক্ষতির সরাসরি সংঘটক ও ক্ষতি সংঘটনের কার্যকারণের মাঝে পার্থক্য করার এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ও অন্যান্য প্রাণহানি বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত মাসআলায় এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

৫. الْمُتَسَبِّبُ لا يَضْمَنُ إلاّ بالتَّعَدِّي

"কার্যকারণের সংঘটক অন্যায় আচরণ ছাড়া দায় বহন করবে না"

এ মূলনীতিটি মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যার ৯৩ নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে: الْمُتَسَبِّبُ لا يَضْمَنُ إلاّ بِالتَّعَمُّدِ "ইচ্ছাকৃত অন্যায় আচরণ ছাড়া ক্ষতির কারণ সংঘটক দায় বহন করবে না।" এ থেকে বোঝা গেল, ক্ষতির কারণ সংঘটক দায় বহন করবে দুই শর্তে:

১. ইচ্ছাকৃতভাবে করা;
২. অন্যায় আচরণ করা।

এ মূলনীতির আলোকে যদি কাউকে দেখে অপরের জন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়, তাহলে যাকে দেখে ভয় পেয়েছে সে পালিয়ে যাওয়ার দায় বহন করবে না, যতক্ষণ তার থেকে কোন অন্যায় আচরণ প্রকাশ পেয়ে থাকে।[৫৬]

---

[৫৩] ইমাম শাফিয়ী, *আল উম্ম* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০০হি.), খ. ২, পৃ. ১৮৫; আরও দ্রষ্টব্য: ইয়াহইয়া বিন শারফ আন-নবভী, *রওযাতুত তালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতিয়্যিন* (বৈরূত ও দামিশক: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি.), খ. ৯, পৃ. ৩৩১

[৫৪] ইমাম মুহাম্মদ, *আল আসল (আল মাবসূত)*, খ. ৫, পৃ. ৫০০; তূরী, তাকমিলাতুল বাহরির রাইক, খ. ৯, পৃ. ১৩৩

[৫৫] কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬০; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৪৫৪

তবে শায়খ মুস্তাফা যারকা রহ. এ ব্যাপারে মাজাল্লাহর সাথে দ্বিমত পোষণ করে যুক্তি দেখান যে, শরীআহ অন্যের সম্পদ ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় দায়বদ্ধ। বরং তীব্র প্রয়োজনের কারণে হারাম বিষয়াদি বৈধ হওয়ার অবস্থাতেও অন্যের সম্পদ দায়বদ্ধ।[৫৭] এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করার শর্ত যোগ করা ভুল। যেমন কেউ তীব্র ক্ষুধার কারণে অন্যের খাবার খেয়ে ফেলল অথবা শত্রু বা কারো থেকে বাঁচার জন্যে অন্যের গাড়িতে আরোহণ করল, এ অবস্থাতেও সে খাবার ও গাড়ি দায়বদ্ধ থাকবে।

সম্ভবত এই মূলনীতির মূল ভিত্তি হল ইতঃপূর্বে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর অভিমত। বিশেষত তাঁর রায়: إِنَّمَا يَضْمَنُ النَّاخِسُ "ক্ষতিপূরণ দেবে খোঁচা দেয়া ব্যক্তি।" কাযী শুরাইহ (মৃ. ৭৮ হি.), আমির আশশা'বী (১৯-১০৩ হি.) রহ. ও অন্যদের থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত রয়েছে।

আভিধানিক অর্থে سَبَبٌ সাবাব অর্থ রশি। রূপকার্থে এমন প্রত্যেক বিষয়কেই সাবাব বলা হয়, যা দ্বারা কোন কাজ সংঘটন পর্যন্ত পৌঁছা যায়।[৫৮] আর مُتَسَبِّب মুতাসাব্বিব বলা হয়, যে এমন কাজ করে, যার মাধ্যমে কোন কাজ ঘটে। তবে সে সরাসরি ঐ কাজ ঘটায় না।[৫৯]

যদি কোন দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তি কারণ হয়, তাহলে কার্যকারণ সংঘটকের উপর ক্ষতির দায় এই শর্তে বর্তাবে যে, সে অন্যের মালিকানায় অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছে। যেমন কেউ প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে নিজ ঘরের সামনে রাস্তায় কুয়া খনন করল, অথবা প্রশাসনের অনুমতিসাপেক্ষে করল কিন্তু কুয়ার চারপাশে কোন বেড়া বা দেয়াল দিল না, যা কুয়ায় পড়ার ক্ষেত্রে বাধা হবে, এরপর কোন অন্ধ, পশু বা গাড়ি পড়ে গেল, তাহলে ক্ষতি সংঘটনের কারণ ও সংঘটক হিসেবে এই ব্যক্তি প্রাণহানি বা সম্পদ নষ্টের দায় বহন করবে। আর যদি নিজ মালিকানায় কুয়া খনন করে আর কেউ পড়ে যায়, তাহলে সে দায় বহন করবে না, যেহেতু নিজ মালিকানায় কারো হস্তক্ষেপকে অন্যায় হস্তক্ষেপ বলার সুযোগ নেই। সুতরাং অন্যায় আচরণের উপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধানও আরোপিত হবে না।

অনুরূপভাবে যদি কেউ চাকার নিচে পিনজাতীয় কিছু রেখে দেয়, আর এ কারণে চাকা নষ্ট হয়, তাহলে চাকা নষ্ট হওয়া এবং এ কারণে যে ক্ষতি হবে তার দায় ঐ

---

৫৬. হায়দার, *দুরারুল হুক্কাম শরহুল মাজাল্লা*, খ. ১, পৃ. ৯৪

৫৭. যারকা, *আল মাদখালুল ফিকহিয়্যুল আম*, খ. ২, পৃ. ১০৪৬

৫৮. আল-ফাইয়্যুমী, *আল মিসবাহুল মুনীর*, মাদ্দাহ (সাবাব); আবুল বাকা আল কাফাওয়ী, *আল কুল্লিয়্যাত* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩হি.), পৃ. ৪৯৫, ৫০৩

৫৯. যারকা, *আল মাদখালুল ফিকহিয়্যুল আম*, খ. ২, পৃ. ১০৪৫; হামাওয়ী, *শরহ আলা কাওয়াঈদি ইবনু নুজাইম*, খ. ১, পৃ. ৪৬৬

ব্যক্তি বহন করবে। এভাবেই এককভাবে ক্ষতি সংঘটনের কারণে যে ক্ষতি ঘটিয়েছে সেই এর দায় বহন করবে, কেননা সেই অন্যায় আচরণ করেছে।

কিন্তু যদি কোন ক্ষতি সংঘটনের ক্ষেত্রে সরাসরি সংঘটক ও কার্যকারণের সংঘটক একত্রিত হয়, তাহলে কার দায়ে ক্ষতিপূরণ বর্তাবে? এ বিষয়ে সামনের মূলনীতিতে আলোচনা করা হবে।

৬. إذا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ و الْمُتَسَبِّبُ يُضَافُ الْحُكْمُ إلى الْمُبَاشِرِ

“যদি কোন ক্ষেত্রে সরাসরি সংঘটক ও কার্যকারণের সংঘটক মিলিত হয়, তাহলে ক্ষতির সম্পর্ক হবে সরাসরি সংঘটকের সাথে।”

এ মূলনীতিটি হুবহু বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু নুজাইম [মৃ. ৯৭০ হি.] রহ. প্রণীত আল আশবাহ থেকে গৃহীত।[৬০] এটি মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যার ধারা (৯০)-এর মূল বক্তব্যও। ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, ‘মুবাশির’ হল যে সরাসরি ক্ষতি ঘটায় আর ‘মুতাসাব্বিব’ হল যে কোন ক্ষতি সংঘটনের কারণ ঘটায়।

এর উদাহরণ হল, কেউ রাস্তায় কুয়া খনন করল, এরপর দ্বিতীয় কেউ তৃতীয় আরেকজনের মালিকানাধীন জন্তু কুয়ায় ফেলে দিল, এ অবস্থায় জন্তুর প্রাণহানির ক্ষেত্রে দু'জন একত্রিত হল। যদি কুয়া খনন না করা হতো, তাহলে প্রাণহানি হতো না। একইভাবে দ্বিতীয়জন যদি নিক্ষেপ না করতো তাহলেও প্রাণহানি হতো না। এ অবস্থায় সরাসরি সংঘটক অর্থাৎ যে নিক্ষেপ করেছে তার সাথে প্রাণহানির সম্পর্ক হবে। কেননা প্রাণহানির ক্ষেত্রে তার ভূমিকা জোরালো। অনুরূপভাবে যদি কেউ চোরকে আরেকজনের ঘর দেখিয়ে দেয় আর চোর চুরি করে, তাহলে হাত কাটা যাবে চোরের; যে দেখিয়ে দিয়েছে তার নয়। কেননা চুরির অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে চোরের ভূমিকা বেশি। তবে এ সবকিছুর সাথে সাথে যে কারণ ঘটিয়েছে তাকেও অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যদি একজন আরেকজনকে জাপটে ধরে রাখে আর তৃতীয় আরেকজন এ ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে কিসাস আরোপিত হবে তৃতীয় ব্যক্তির উপর; যে ধরে রেখেছিলো তার উপর নয়। আর যে ধরে রেখেছিল যদিও তার উপর কিসাস আরোপিত হবে না; তবু তাকে ধরে রাখার কারণে শাস্তি দেয়া হবে।[৬১]

---

৬০. ইবনু নুজাইম, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, পৃ. ১৮৭, কায়িদা নং-১৯; সুয়ূতী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, পৃ. ১৬২, কায়িদা-৪০।

৬১. এ জাতীয় বিভিন্ন দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য: *দুরারুল হুক্কাম*, খ. ১, পৃ. ৯১; যারকা, *শরহুল কাওয়াঈদিল ফিকহিয়্যাহ*, পৃ. ৩৭৯

উপরিউক্ত ফিকহী মূলনীতিসমূহের আলোকে সমসাময়িক আলিমগণ ড্রাইভিং সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনাসমূহের বিভিন্ন ধরনের শরয়ী বিধান নিরূপণের প্রয়াস নিয়েছেন। নিম্নে সংক্ষেপে দুর্ঘটনার প্রকৃতি ও তার বিধান আলোচনা করা হলো।[৬২]

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যানবাহনের মাধ্যমে যা ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হবে সে বিষয়ে চালক দায়ী থাকবে। কেননা তিনিই যানবাহনের সঞ্চালক এবং বাহন হলো তার কর্তৃত্বে থাকা একটি যন্ত্রমাত্র। তার ইচ্ছায় গাড়ি চলে এবং থামে। সুতরাং এ গাড়ির মাধ্যমে যা কিছু ঘটবে সে ক্ষেত্রে চালক শরীয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে দায়ী হবে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এ প্রসংগে পূর্ববর্তী যুগের মাসআলা ও মূলনীতির আলোচ্য বিষয় তথা জন্তুর সাথে বর্তমান যুগের যান্ত্রিক বাহনের তুলনা করে বিধান নিরূপণের প্রয়াস নেয়া হচ্ছে; কিন্তু জন্তুর ক্ষয়ক্ষতি ও বর্তমানের গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। তা হলো, জন্তু কখনো কখনো নিজ ইচ্ছা ও গতিতে চলাফেরা করতে পারে বরং ক্ষেত্রবিশেষে কোচোয়ান জন্তুর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে, তখন তো ফকীহগণ কোচোয়ানের উপর ক্ষতিপূরণের দায় আরোপ করেন না; বরং স্বাভাবিক অবস্থায়ও ফকীহগণ জন্তুর আরোহীর কর্তৃত্ব থাকা অবস্থায় জন্তু পেছনের পা দিয়ে যা ক্ষতি করে তার দায় আরোহীর উপর চাপান না, যেহেতু এ জাতীয় ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। পক্ষান্তরে গাড়ি হল চালকের কর্তৃত্বে থাকা একটি যন্ত্রমাত্র। সে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা গাড়ি চালাতে পারে। অনুরূপভাবে থামাতেও পারে।

এ পার্থক্য থাকার কারণে আমরা বলবো, গাড়ি সামনে পেছনে যে কোন পাশে যা ক্ষয়ক্ষতি ঘটাবে তার দায় বহন করবে চালক। কেননা যে কোন বিচারে ক্ষয়ক্ষতি চালকের উপর বর্তাবে।[৬৩]

সুতরাং ক্ষতি যদি অন্যায় ব্যবহারের কারণে হয়, যেমন লাল দাগ ক্রস করে চলে গেল অথবা একমুখি রাস্তায় বিপরীত দিকে চলল, অথবা এমন ভীড়ের মাঝে দ্রুতগতিতে চালাল যেখানে ধীরে চালানোটাই কাম্য, অথবা অননুমোদিত জায়গায় গাড়ি থামিয়ে রাখল, এরপর গাড়ি সামনে বা পেছনে নিয়ে গেল, অথবা ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, এ সকল অবস্থায় গাড়ির কারণে যা ক্ষতি হবে, কোন সন্দেহের অবকাশ ছাড়া চালক ক্ষতির দায় বহন করবে। যেহেতু সে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করেছে। আর সরাসরি সংঘটক সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ বহন করে। সুতরাং অন্যায় ব্যবহার করলে ক্ষতিপূরণ বহনের বিষয়টি আরো স্বাভাবিক, যেমনটা উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে তা স্পষ্ট হয়েছে।

---

৬২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ আল-খাতীব, "মাসউলিয়্যাতু সাইক্বিস সাইয়্যারাহ", পৃ. ১৭১-১৭৮

৬৩. উসমানী, *বুহুসুন ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাতিন মু'আসিরা*, পৃ. ৩১১

কিন্তু ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং অন্য কারো কষ্ট বা ক্ষতি না করার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা সত্ত্বেও যদি ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে কী বিধান হবে?

এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মত হলো- চালকই ক্ষতিপূরণ বহন করবে এই যুক্তিতে যে, ক্ষতির সরাসরি সংঘটককে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে। রাস্তার সুবিধা ভোগ করা যদিও চালকের অধিকার; তবুও এ জন্য শর্ত হলো- ক্ষতির আশংকামুক্ত থাকা এবং অন্যের কষ্ট ও ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা। যখন অন্যের ক্ষতি করা থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না অর্থাৎ বিষয়টি তার আওতার বাইরে গিয়ে, ক্ষতি সংঘটনের অন্য কোন কারণ ঘটাল, তাহলে পরবর্তী কারণটিই ক্ষতি সংঘটনের কারণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

১. চালক যদি খুব সতর্কতার সাথে ট্রাফিক আইন পুরোপুরি মেনে চলে, এরপর গাড়ির নিকট দূরত্বে (যেমন এক মিটার) কেউ অপরকে ধাক্কা দিল অথবা কোন আসবাবপত্র ফেলে রাখল, আর চালক সেটাকে ধ্বসিয়ে দিল, তাহলে মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, চালক ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা তাঁদের মতে, জন্তু কর্তৃত্ব ছাড়া হয়ে গেলে সে কারণে ক্ষতিপূরণ রহিত হয় না। তবে ইচ্ছাকৃত ক্ষতি করার গোনাহ হয় না।[৬৪] আর সরাসরি সংঘটক ক্ষতিপূরণ বহন করবে। অপরদিকে হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মতে, চালক ক্ষতিপূরণ বহন করবে না।

এ মাসআলায় হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মতই প্রণিধানযোগ্য। এর কারণ হচ্ছে:

ক. ক্ষতি সংঘটনের শক্তি। এ অবস্থায় চালক সম্পূর্ণভাবে নিরূপায় এবং গাড়িও ইখতিয়ারহীন। আর ক্ষতির কারণ সংঘটক অন্যায় হস্তক্ষেপ করলে সে ক্ষতিপূরণ বহন করবে। আলোচ্য অবস্থায় যা ঘটানো হয়েছে এর চেয়ে বড় অন্যায় হস্তক্ষেপ আর কী হতে পারে, যার কারণে চালকের পক্ষে দুর্ঘটনা রোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে?!

খ. যুক্তি ও বুদ্ধির বিচারে চালককে আলোচ্য অবস্থায় ক্ষতির সংঘটক বলার সুযোগ নেই। কেননা দুর্ঘটনা ঘটানোর ক্ষেত্রে ধাক্কা দেয়া ব্যক্তির ভূমিকা আরোহীর চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং এখানে ধাক্কা দেয়া ব্যক্তিই ক্ষতির সংঘটক। সুতরাং তার উপরই ক্ষতিপূরণের দায় বর্তাবে।

গ. ধাক্কা দেয়া ব্যক্তি এ অবস্থায় অন্যায় আচরণ করেছে। চালক অন্যায় আচরণ করেনি। আর যে অন্যায় আচরণ করে সে ক্ষতিপূরণ বহন করবে।

---

[৬৪] কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৬; রাফিয়ী, *আল আযীয*, খ. ১১, পৃ. ৩৩১; রমালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯

২. যদি চালক সিগন্যালে গাড়ি থামিয়ে সবুজ সিগন্যালের অপেক্ষা করতে থাকে, এসময় পেছন থেকে যদি কোন বাহন এসে এ গাড়িকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে এ গাড়ি সামনের গাড়িকে ধাক্কা দেয়, তাহলে এ কারণে যা ক্ষতি হবে তা বহন করবে প্রথম ধাক্কা দেয়া গাড়ি। কেননা এ অবস্থায় থামিয়ে রাখা গাড়ির চালক ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছে বলা সম্ভব নয়।

এ মাসআলাটির পূর্বনমুনা হল সেই আরোহী, যার জন্তুকে আরেকজন খোঁচা দেয়ার কারণে সেই জন্তু অপরের কোন ক্ষতি করেছে। এ অবস্থায় ফকীহদের সকলের মতে, যে খোঁচা দিয়েছে সে ক্ষতিপূরণ দেবে; আরোহী নয়।[৬৫] আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, সৌদী আরবও এ মতটিকেই গ্রহণ করেছে।[৬৬]

এ অবস্থায় প্রথম ধাক্কা দেয়া গাড়ির যা ক্ষতি হয়েছে তা বিনিময়শূন্য বলে ধর্তব্য হবে। ধরে নেয়া হবে, সে নিজ সম্পদ নষ্ট করেছে। পূর্বে উল্লেখিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর আছার এ মতকে আরও শক্তিশালী করে।

৩. যদি গাড়ি ক্ষতির আশংকামুক্ত থাকে, গাড়ির দেখভাল করার বিষয়ে চালকের কোন অবহেলা না থাকে, চাকা ও ব্রেক সবই ঝুঁকিমুক্ত থাকে, আর স্থান অনুপাতে গাড়ির গতি থাকে স্বাভাবিক এবং চালক যদি কোন অন্যায় ব্যবহার বা নিয়মলঙ্ঘন না করে গাড়ি চালায়, এরপরও গাড়ির কোন চাকা খুলে গিয়ে গাড়ি রাস্তা থেকে সরে যায় অথবা উল্টে যায় আর এর ফলে কোন জানমালের ক্ষতি হয়, তাহলে চালককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

এর পূর্বনমুনা হল সেই জন্তু, যা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয় এবং আরোহীর কর্তৃত্বের বাইরে চলে যায়, সে ক্ষেত্রে আরোহী ক্ষতিপূরণ বহন করবে না। যেহেতু এতে আরোহীর কোন ত্রুটি নেই, তাই সে ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছে বলার সুযোগ নেই। তবে কারো কারো মত হলো, আরোহী ক্ষতি সংঘটনের কারণ ঘটিয়েছে। তাই সে ক্ষতিপূরণ দেবে।

৪. গাড়ি যদি ভালভাবে সচল না হয়, সে কারণে চালক অন্যকে গাড়িটি সচল করার জন্যে সামনে পেছনে ধাক্কা দিতে বলে, এ অবস্থায় সে গাড়ির কারণে কারো জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয় তবে উভয়ে মিলে ক্ষতিপূরণ দেবে। এর পূর্বনমুনা হল সকল ফকীহের মতে, জন্তু কোন ক্ষয়ক্ষতি করলে কোচোয়ান ও আরোহী উভয়ে সম্মিলিতভাবে ক্ষতিপূরণ দেবে।[৬৭] জন্তুর কোচোয়ান হল এ অবস্থায় ধাক্কা দেয়া

---

[৬৫] আল-ফারগানী, *আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা*, খ. ৬, পৃ. ৫১; আল-কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৫; রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৫৪৪

[৬৬] *মাজাল্লাহ ইসলামিয়্যা*, সংখ্যা. ২৬, ১৪০৯-১৪১০ হি.।

[৬৭] আশ-শায়বানী, *আল মাবসূত*, খ. ২৭, পৃ. ৪; আল-কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৪; ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৫৪৫

ব্যক্তির ন্যায়। আর জন্তুতে আরোহী ব্যক্তি হল আলোচ্য অবস্থায় গাড়ির চালকের ন্যায়। সুতরাং তারা উভয়ে ক্ষতিপূরণ দেবে।

কারো কারো মতে, ক্ষতিপূরণ শুধু আরোহী অর্থাৎ গাড়ির চালক প্রদান করবে। এটি শাফিয়ী মাযহাবের মত অনুসারে কিয়াসের দাবি।[৬৮] কেননা চালক ও আরোহীর কর্তৃত্ব গাড়ি ও জন্তুর ক্ষেত্রে বেশি। এটিই অগ্রগণ্য মত। কেননা চালকের পক্ষে ব্রেকের মাধ্যমে গাড়িকে থামিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল। তাছাড়া যে ধাক্কা দিচ্ছে সে তো গাড়ির সামনে কী আছে তা দেখতে পাচ্ছে না। তবে যদি ঐ ব্যক্তি সামনে থেকে ধাক্কা দেয় তাহলে উভয়ে মিলে ক্ষতিপূরণ দেবে, যেমনটা অন্য সকল ফকীহের মত।

৫. যদি কেউ কোন গাড়ি চুরি করে, জবরদখল করে, ধার নেয়, ভাড়া নেয় অথবা বন্ধক নেয়, এরপর গাড়ির মাধ্যমে কোন প্রাণহানি বা সম্পদের ক্ষতি করে, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্বের সকল মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এর কারণ, গাড়ি এখন তার অধীন; মালিকের অধীন নয়। সে-ই এখন গাড়ি চালাচ্ছে, গাড়ির দেখাশোনা ও সংরক্ষণ তার দায়িত্ব।[৬৯]

৬. যদি কেউ লাল সিগন্যাল অতিক্রম করে কোন ব্যক্তি বা গাড়িকে ধাক্কা দেয়, তাহলে শাসকের অনুমোদিত আইন লঙ্ঘনের কারণে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। পাশাপাশি অন্যের ক্ষতি করার কারণেও সে গোনাহগার হবে। যে মানুষ বা সম্পদের ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ সে বহন করবে। কেননা সে সরাসরি ক্ষতির সংঘটক। যে সরাসরি ক্ষতি ঘটায় সে অন্যায় ব্যবহার না করলেও ক্ষতিপূরণ দেয়। আলোচ্য অবস্থায় চালক অন্যায় করেছে, সুতরাং তার ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে।

যদি উভয়ে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, উভয়ে লাল সিগন্যাল ক্রস করে একে অপরের সাথে সংঘর্ষ বাঁধিয়েছে, তাহলে প্রত্যেকে অপরের সম্পদের ক্ষতির দায় বহন করবে। আর প্রত্যেকের আকিলা অপরের শারীরিক যে ক্ষতি হয়েছে তার দায় বহন করবে।

৭. কেউ নিজ পথে গাড়ি চালাচ্ছে, এরপর পেছন থেকে কেউ তাকে ধাক্কা দিল, তাহলে পেছনে থাকা ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা পেছনের ব্যক্তি ধাক্কা দিয়েছে আর সামনে থাকা ব্যক্তি ধাক্কার শিকার হয়েছে। পেছনে থাকা ব্যক্তি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা তার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তা হবে বিনিময়শূন্য। কেননা সে নিজেই নিজের ও নিজ গাড়ির ক্ষতি করেছে।[৭০]

---

৬৮. সুলায়মান আল-বুজাইরিমী, *তাজরীদ লিনাফইল আবীদ [হাশিয়াতুল বুজায়রীমী আলা শরহিল মানহাজ]*, (কায়রোঃ মাতবাআতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৩৪৫হি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৫

৬৯. আল-বুজায়রিমী, *হাশিয়াতুল বুজায়রীমী আলা শরহিল মানহাজ*, খ. ৪, পৃ. ২৪৪

৭০. ইবন কুদামাহ, *আল মুগনী*, পৃ. ১২, পৃ. ৫৪৬

৮. গাড়ির চালক অপ্রাপ্তবয়স্ক হলেও ক্ষয়ক্ষতির দায় অর্থাৎ দিয়্যাত ও ক্ষতিপূরণ বহন করার ক্ষেত্রে সে প্রাপ্তবয়স্কের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। সে গাড়ি চালনায় অন্যায় করুক বা না করুক- বিধান অভিন্ন। কেননা, অপ্রাপ্তবয়স্কের ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের বিধান ভুল বলে ধর্তব্য হবে; বিনিময়শূন্য বলে ধর্তব্য হবে না। যদিও অন্যায় করলেও তার কাজকে গোনাহ বলা যায় না। চার ইমাম-ই এ বিষয়ে একমত। অপ্রাপ্তবয়স্ক যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় তার কারণে সে ক্ষতির দায় বহন করবে- এ সম্পর্কে ফকীহদের নিম্নোক্ত বক্তব্যসমূহ উল্লেখযোগ্য।

হানাফী মাযহাবের ফকীহ ইবনু নুজাইম [মৃ. ৯৭০ হি.] রহ. বলেন, লেনদেন নিষিদ্ধ বালককে তার কাজের কারণে পাকড়াও করা হবে। সুতরাং যে সম্পদ সে নষ্ট করবে তার ক্ষতিপূরণ সে দেবে। আর যদি সে কাউকে হত্যা করে তাহলে দিয়্যাত বহন করবে তার আকিলা।[৭১]

শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহ আবুল হুসাইন আল'উমরানী [৪৮৯-৫৫৮ হি.] রহ. বলেন, এটি প্রতিষ্ঠিত যে, শিশু ও পাগল যদি অন্যের সম্পদ নষ্ট করে, তাহলে তাদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক হয়।[৭২]

ফকীহ ইবনু কুদামা আলহাম্বলী [৫৪১-৬২০ হি.] রহ. বলেন, শিশু ও পাগলের ক্ষেত্রে সেই বিধান প্রযোজ্য, যা বোধহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যের অনুমতি ছাড়া কোন সম্পদ নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ দেয়া সবার জন্য আবশ্যক।[৭৩]

সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক চালক যদি অন্যের কোন ক্ষতি করে, যদি ক্ষতির শিকার বস্তুটি হয় সম্পদ, তাহলে তার সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কোন মানুষ, তাহলে তার দায় বহন করবে তার আকিলা।

৯. মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার আলোচনায় ফকীহগণ দুই অশ্বারোহী ও দুই জাহাজের সংঘর্ষের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, যদি দুই অশ্বারোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, তাহলে প্রত্যেকে অপরের প্রাণহানি, পশু বা সম্পদের যা ক্ষতি হয়েছে তার দায় বহন করবে। আর যদি দুই জাহাজের সংঘর্ষ হয়, তাহলে প্রত্যেক জাহাজ অপর জাহাজে থাকা জানমালের ক্ষতির দায় বহন করবে। এ বিষয়ে ফকীহগণ আরও বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তবে ক্ষতিপূরণ বহনের অংশ নিয়ে ফকীহদের দুটি মত রয়েছে।

---

[৭১] ইবনু নুজাইম, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, পৃ. ৩০১; দ্রষ্টব্যঃ ইবনু আবিদীন, *আদ দুররুল মুখতার*, খ. ৬, পৃ. ১৪৬

[৭২] আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া আল-উমরানী, *আল বায়ান শরহ আল-মুহাজ্জাব* (জিদ্দাহঃ দারুল মানহাজ, ১৪২১হি.), খ. ৬, পৃ. ২৩৩

[৭৩] *আল মুগনী*, খ. ৬, পৃ. ৬১১; বাহুতী, *শরহ মুনতাহাল ইরাদাত*, খ. ৪, পৃ. ১৭০; দাসূকী, *আশ শারহুল কাবীর*, খ. ৪, পৃ. ৪৮০

প্রথম মত হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের:[৭৪] প্রত্যেক সংঘর্ষকারী অপরের যে সম্পদের ক্ষতি হয়েছে তার দায় বহন করবে। আর দিয়্যাত বা আঘাতের দায় বহন করবে প্রত্যেকের আকিলা। এর পক্ষে দলিল হিসেবে তাঁরা বলেন:

ক. পারস্পরিক সংঘর্ষে যারা নিহত হয়েছে নিহতদের ক্ষতিপূরণের দায় প্রতিপক্ষের উপর বর্তাবে। যেমন যদি সে তার বাহন দাঁড় করিয়ে রাখতো, আর সে অবস্থায় অপরজন তাকে আঘাত করতো, তাহলে তো একই বিধান হতো। এরপর দেখা হবে, প্রত্যেকের কাছে কী পরিমাণ সম্পদ বা আসবাবপত্র রয়েছে। এরপর সে সম্পদ থেকে প্রত্যেকে অপরকে ক্ষতিপূরণ দেবে। আকিলার সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না।

খ. আলী রা. থেকে বর্ণিত, দুজন ব্যক্তির প্রত্যেকে অপরকে আঘাত করেছিল। এরপর প্রত্যেকে অপরের দিয়্যাত বহন করেছে।[৭৫]

দ্বিতীয় মত মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহদের: প্রত্যেকে অপরের অর্ধেক ক্ষতির দায় বহন করবে। আর প্রত্যেকের আকিলা বহন করবে অপরের দিয়্যাতের অর্ধেক অংশ। এর পক্ষে তাঁরা বলেন, প্রত্যেকে মারা গিয়েছে নিজের ও অপরের সংঘর্ষের কারণে। সুতরাং নিজের কারণে যা ঘটেছে সেটা হবে বিনিময়শূন্য। অতএব অপরের কারণে ঘটে যাওয়া ক্ষতির অর্ধেকের দায় বর্তাবে।

তবে দু'টি মতের মধ্যে মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাবের মতটিই অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা উভয় সংঘর্ষকারীই মারা গিয়েছে। সুতরাং তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে অন্যের বোঝা বাড়ানো এবং নিকট বা দূরবর্তী আকিলার জন্যে এ বোঝা বহন না করাই অধিক যুক্তিসম্মত।

তবে বাস্তবতা হলো, সংঘর্ষের বিষয়টি আরও বিশদ বিবরণ ও আলোচনার দাবি রাখে। পূর্বসূরী ফকীহগণ যে আলোচনা করেছেন নিঃসন্দেহে তা সে সময়ের উপযোগী ছিল। বর্তমান সময়ের পরিস্থিতি ও বাস্তবতা পাল্টে গেছে। তাই এ মাসআলায় একাধিক ধরন আলোচিত হওয়ার অবকাশ রাখে।

এক: রাস্তা যদি এক লেনের হয় এবং যাওয়া বা আসার জন্যে আলাদা কোন চিহ্ন না দেয়া থাকে, দুর্ঘটনার সময় রাত হয় এবং এমন কোন প্রমাণ না থাকে যে, দুজনের কে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণ করেছে, তবে উভয়ে ক্ষতিপূরণ দেবে।

---

৭৪. ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৫৪৫; মানসূর আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮হি.), খ. ৬, পৃ. ৮

৭৫. আবদুর রাযযাক, *মুসান্নাফ*, খ. ১০, পৃ. ৫৪, (১৮৩২৮); ইবনে আবী শায়বা, *মুসান্নাফ*, খ. ৫, পৃ. ৪২৩, (২৭৬২৩)

কেননা প্রত্যেকে দুর্ঘটনা ঘটানোর ক্ষেত্রে সরাসরি সম্পৃক্ত। তবে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতির প্রভাব কমানোর যুক্তিতে মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহদের মত গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে।

যদি এক্ষেত্রে কোন প্রমাণ বা সূত্র পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে একজনের ভুল চালানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়, যেমন এই রাস্তাটি ছিল চিহ্নযুক্ত আর প্রমাণ সাব্যস্ত করে যে, একজন গাড়ি নিয়ে বিপরীত লেনে চলে গেছে, এরপর অপর গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয়েছে, তাহলে যে সম্পদের ক্ষতি হবে তার দায় বহন করবে বিপরীত লেন থেকে আসা ব্যক্তি, যদি সে জীবিত থাকে। আর মারা গেলে তার সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ বহন করা হবে। আর যে প্রাণহানি ঘটবে তার দিয়্যাত বহন করবে তার আকিলা। যেহেতু এ চালক সরাসরি ক্ষতির সংঘটক। আর যে সরাসরি ক্ষতি সংঘটক সে অন্যায় আচরণ না করলেও ক্ষতির দায়ভার বহন করে। যেমনটা ক্ষতির দায় বহনের বিশেষ মূলনীতির প্রথম মূলনীতিতে আলোচিত হয়েছে।

দুই: যদি রাস্তা হয় দু'সারির আর কোন গাড়ি দ্রুতগতির কারণে নিজ লেন ছেড়ে বাঁ দিকে চলে যায়, এরপর কোন গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয়, তাহলে পূর্বে উল্লেখিত বিধান অনুসারে জানমালের যে ক্ষতি হবে লেন পরিবর্তনকারী তার ক্ষতিপূরণ দেবে, যেহেতু সে সরাসরি ক্ষতির সংঘটক। আর যে সরাসরি দুর্ঘটনা ঘটায় সে দায় বহন করে, যেমন প্রথম মূলনীতিতে আলোচিত হয়েছে।

তিন: ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি গাড়ির মাঝে পরস্পর সংঘর্ষ হলে, যদি একজন মারা যায় অপরজন থেকে কিসাস নেয়া হবে। কেননা প্রবল ধারণা এটাই যে, সংঘর্ষের কারণেই অপরজন নিহত হয়েছে। আর যদি উভয়ে মারা যায় তাহলে কোন কিসাস নেয়া হবে না, যেহেতু কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্র নেই। আর যদি একজন ইচ্ছাকৃত অপরজনের ভুলবশত সংঘর্ষ বেঁধে যায়, তাহলে প্রত্যেকের বিধান আলাদা আলাদা হবে।

১০. যদি কারো গাড়ি নিজ মালিকানাধীন জায়গায় বা নিজ বাড়ির সামনে বা গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমোদিত স্থানে বা প্রশস্ত সড়কের পাশে থেমে থাকে এবং এ অবস্থায় একটি চলন্ত গাড়ি এসে তাকে আঘাত করে, তাহলে চলন্ত গাড়ির চালক তার আঘাতের কারণে থেমে থাকা গাড়ির যে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ বহন করবে। কেননা সে অন্যায়ভাবে গাড়ি চালিয়েছে।

যদি মালিকানাধীন জায়গার বাইরে কোন সংকীর্ণ পথে বা ভীড়ের মাঝে অননুমোদিত স্থানে গাড়িটি থেমে থাকে, তাহলে উভয়ে ক্ষতিপূরণ বহন করবে, যেহেতু প্রত্যেকেই গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণ করেছে। থেমে থাকা গাড়ি থেমে থাকার মাধ্যমে অন্যায় করে ক্ষতি সংঘটনের সহায়ক হয়েছে আর চলন্ত গাড়ি তো স্বয়ং সংঘটক।

আরেকটি মত হল, চলন্ত গাড়ির চালকই ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা সে সরাসরি ক্ষতি সংঘটন করেছে। আর যখন কোন দুর্ঘটনায় দুজন একত্রিত হয়, যার একজন সরাসরি দুর্ঘটনা সংঘটন করে আর অপরজন ক্ষতি সংঘটনের কারণ হয়, তখন দুর্ঘটনার বিধান

(অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ) আরোপিত হবে যে সংঘটন করেছে তার প্রতি।[৭৬] তবে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, থেমে থাকা গাড়ির চালক ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা সে ক্ষতি সংঘটনের কারণ এবং অন্যায় ব্যবহারকারী। এই শেষোক্ত মতের ভিত্তিতেই ফতোয়া প্রদান করেছে আল লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, সৌদী আরব।

তবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হলো, উভয়ে ক্ষতির দায় বহন করবে। কেননা প্রত্যেকে নিজ ক্ষেত্রে অন্যায় ব্যবহার করেছে। লাজনার দেয়া মতেও এ মতের সামান্য আভাস রয়েছে।

১১. যদি গাড়ি পণ্য বা মানুষবোঝাই থাকে, এরপর চালক তীব্রগতিতে গাড়ি চালায় এবং গাড়ির সামনে থাকা কাউকে ক্রস করার জন্যে অথবা সামনে গর্ত দেখার কারণে হঠাৎ ব্রেক করে, ফলে গাড়ি থেকে কোন পণ্য বা মানুষ পড়ে যায়, তাহলে চালক ক্ষতিপূরণ বহন করবে। কেননা, তার অন্যায় আচরণের কারণেই ক্ষতিটি সংঘটিত হলো।

যদি কেউ পালানোর উদ্দেশ্যে গাড়ি থেকে লাফ দেয়, এ কারণে তার কোন অঙ্গহানি ঘটে কিংবা ভেঙ্গে যায় অথবা সে মারা যায়, তাহলে চালক ক্ষতিপূরণ দেবে না। যেহেতু চালক এক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হলেও পলায়নপর ব্যক্তিই সরাসরি নিজের ক্ষতি সম্পাদন করেছে। আর যখন কোন ক্ষতি সম্পাদনের ক্ষেত্রে একজন হয় কারণ, আর অপরজন সরাসরি তা সম্পাদন করে, তখন যে ক্ষতি সম্পাদন করে ক্ষতির দায়ভার সে বহন করে, যেমন পূর্বে মূলনীতিতে আলোচিত হয়েছে।

এ জাতীয় নমুনা ও উদাহরণের কোন শেষ নেই। এ পরিসরে যে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে উল্লিখিত নমুনাগুলো তার প্রায়োগিক চিত্রমাত্র। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কর্তব্য, কোন দুর্ঘটনার সংবাদ পেলে সেখানে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অনুসন্ধান চালানো এবং বিস্তারিত তদন্ত করা। পাশাপাশি বিচারকের কর্তব্য, রায় দেয়ার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে ফয়সালা দেয়া।

উপসংহার

ইসলামী শরীআহ ড্রাইভিং-এর যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তা পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত দিক-নির্দেশনার আলোকে ফকীহগণ এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যা থেকে বর্তমান সময়ের যান্ত্রিক বাহন চালনার বিধি-বিধান অভিযোজন করার মাধ্যমে আধুনিক সমাজের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত ড্রাইভিং আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে শরীআহর মূল বিবেচ্য নীতি হলো, মাসালিহ মুরসালা বা জনকল্যাণ। যেসব বিধান শরীআহর মৌলিক নীতির পরিপন্থী নয় এমন বিষয়কে মানবতার কল্যাণে প্রয়োগ করা ও তাকে বিধান হিসেবে নির্ধারণ করা যে কোন সমাজের আইনের উৎস হিসেবে গণ্য।

---

৭৬. সুয়ূতী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, পৃ. ১৬২; ইবনু নুজাইম, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, পৃ. ১৮৭

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন : ২০১৬

ফিক্হী ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) : স্বরূপ ও শিষ্টাচার

ড. আহমদ আলী*

Juristic Disagreement : Nature & Manners

ABSTRACT

Mujtahid Imāms of different juristic schools of thought differ in many practical affairs of Islam based on evidences from Sharī‘ah It's caused by the differences in viewpoints of Imāms, inexplicitness of evidences from Sharī‘ah and sometimes limitation in their knowledge on evidences. This difference in views is sometimes simply external and of linguistic nature, and often related to the determination of nature of 'amal (action/work); though sometimes this may be contradictory in nature. Sometimes this difference remains confined within the 'amal (action) only and doesn't affect rules of Sharia itself. Such disagreement on many affairs due to the difference in viewpoints, understanding as well as knowledge is one of the instances of Allah's skillful creations and it is spontaneous and natural. This type of disagreements is not objectionable if these happen based on authentic evidences of Sharī‘ah and proper reasoning and aren't devoid of etiquette & morality. Sometimes it's beneficial too. The definition of Ikhtilāf (juristic disagreement), rules and classification of juristic disagreement, its nature and manners, its mode in various era and benefits of liberal disagreements of Imāms etc. are gathered in a descriptive and deductive methods in this article.

Keywords: *Ikhtilāf (disagreement); Ijtihād (juristic opinion); Adāb (manners); Rahmat (compassion).*

সারসংক্ষেপ

দীনের ব্যবহারিক অনেক বিষয়ে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। এর কারণ, কখনো তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য, কখনো

* প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

দলীলের দ্ব্যর্থকতা বা প্রচ্ছন্নতা, কখনো তাঁদের দলীল সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। উপরন্তু, তাঁদের এ মতভিন্নতা কখনো বাহ্যিক ও শাব্দিক হয়ে থাকে; কখনো তা 'আমালের স্বরূপ নির্ণয় কেন্দ্রিক হয়ে থাকে, কখনো তা পরস্পর বিরোধীও হয়ে যায়। আবার কখনো এ ভিন্নতা কেবল 'আমলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; বিধান পর্যন্ত গড়ায় না। দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি-বিবেকগত তারতম্যের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে মতভিন্নতা দেখা দেয়, তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি নৈপুণ্যের একটি নিদর্শন এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তা তৈরি হয়। এরূপ মতভিন্নতা দূষণীয় নয়, যদি তা বিশুদ্ধ দলীল ও যুক্তিনির্ভর হয় এবং শিষ্টাচার ও নীতিবিবর্জিত না হয়। তদুপরি ক্ষেত্রেবিশেষে তা উপকারীও। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইখতিলাফের পরিচয়, ফিক্হী ইখতিলাফের বিধান ও বিভিন্ন প্রকরণ, বিভিন্ন যুগে ফিক্হী ইখতিলাফের ধরন, প্রকৃতি ও আদাব এবং ইমামগণের উদারনৈতিক ইখতিলাফের (মতপার্থক্যের) সুফল প্রভৃতি বিষয় বর্ণনামূলক ও অবরোহ পদ্ধতিতে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মূলশব্দঃ ইখতিলাফ; ইজতিহাদ; আদাব; রাহ্মাত।

ইখতিলাফ শব্দের অর্থ ও প্রকারভেদ

'ইখতিলাফ' (اختلاف) শব্দটি আরবী। এর প্রকৃত অর্থ ভিন্নতা, পার্থক্য, অসঙ্গতি বৈপরীত্য প্রভৃতি। শব্দটি সাধারণত ভাষা, বর্ণ, অবস্থা, আকৃতি, মত ও পথ তথা যে কোনো ধরনের পার্থক্য, অসঙ্গতি ও ভিন্নতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হলেও মত ও চিন্তা-দর্শনের ক্ষেত্রে পরস্পর ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করার অর্থে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, 'ইখতিলাফ' (اختلاف) শব্দটি সর্বার্থে আরবী ضدّ (বিপরীত) শব্দের সমার্থক নয়। কেননা, পরস্পর বিপরীত প্রত্যেক বিষয়ই ভিন্ন হয়ে থাকে; কিন্তু প্রত্যেক ভিন্ন বিষয় পরস্পর বিপরীত নাও হতে পারে। তাছাড়া 'ইখতিলাফ' (পরস্পর মতভিন্নতা) যেহেতু অনেক সময় বাদানুবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাই শব্দটি রূপকার্থে তর্কবিবাদ (التنازع) অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ অর্থে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ "আর এভাবে তারা হামেশাই নিজেদের মধ্যে তর্কবিবাদ করতে থাকবে।"[১]

ফিকহ শাস্ত্রে 'ইখতিলাফ' বলতে দীনের যে কোনো ব্যবহারিক বিষয়ে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণের পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করাকে বোঝানো হয়। সেই ভিন্নমত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে হতে পারে, কিংবা দলীলের দ্ব্যর্থকতা বা প্রচ্ছন্নতার কারণে হতে পারে অথবা দলীল সংক্রান্ত তাঁদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে হতে পারে।

---

১. আল-কুরআন, ১১ : ১১৮

উল্লেখ্য যে, ইমামগণের এ মতভিন্নতা কখনো বাহ্যিক (صوري) ও শাব্দিক (لفظي/ تعبيري)[২] হয়ে থাকে। কখনো তা 'আমালের স্বরূপ নির্ণয়গত (اختلاف التنوع)[৩] হয়ে থাকে, কখনো তা পরস্পর বিরোধী (اختلاف التضاد)ও[৪] হয়ে থাকে। আবার কখনো এ ভিন্নতা কেবল 'আমালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; হুকুম সাব্যস্ত করে না।[৫]

উল্লেখ্য যে, আরবীতে خلاف (খিলাফ) শব্দটিসাধারণত 'ইখতিলাফ' শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে কেউ কেউ এ দুটি শব্দের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্যও

---

২. যেমন 'আমাল ঈমানের অংশ কী না? এতদসংক্রান্ত ইমামগণের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে তা নিছক শাব্দিক ও অভিব্যক্তিগত। ('আইনী, *উমদাতুল কারী,* খ. ১, পৃ. ২৭৬) এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা রাহ.-এর মত হলো, 'আমাল ঈমানের অংশ নয়। তিনি তাঁর এ মত সত্ত্বেও কখনোই ঈমানের জন্য 'আমালের গুরুত্বকে ছোট করে দেখেননি। কাজেই জানা যায় যে, তাঁর কথার আসল উদ্দেশ্য হলো, 'আমাল ঈমানের মৌলিক অংশ নয়; বরং পরিপূরক শর্ত। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামের মতে, 'আমালও ঈমানের একটি অংশ। তবে তাঁদের কেউ এরূপ কথা বলেননি যে, কেউ যদি 'আমালের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করে, তা হলে সে বে-ঈমান হয়ে যাবে। এ থেকে বুঝা গেল, তাঁদের কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, 'আমাল ঈমানের মৌলিক অংশ। বরং তাঁদের কথার উদ্দেশ্য হলো- 'আমাল ঈমানের একটি পরিপূরক অংশ। অতএব, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে তা নিছক শাব্দিক ও অভিব্যক্তিগত পার্থক্য; পরস্পর বিরোধী মত নয়।

৩. যেমন কোনো ইমাম কোনো একটা 'আমালকে ওয়াজিব বলেছেন, আবার অন্য ইমাম একই 'আমালকে ফরয বলেছেন। অনুরূপভাবে কোনো ইমাম কোনো একটা 'আমালকে সুন্নাত বলেছেন, অপর কোনো ইমাম একই 'আমালকে মুস্তাহাব্ব বলেছেন। বস্তুত প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এ মতপার্থক্যের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই।
আবার এমনও অনেক 'আমাল রয়েছে, যা মৌলিকত্বের বিচারে সর্বসম্মতভাবে প্রমাণসিদ্ধ; তবে এ 'আমালসমূহ আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতিও সমাজে প্রচলিত রয়েছে এবং এ সব পদ্ধতি সকলের মতে মেনে চলাও জায়িয। (যেমন- দু'আ কুনূত রুকু'র আগে বা পরে পড়া) তবে এ 'আমালসমূহের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কোন্ পদ্ধতিটি অধিকতর বিশুদ্ধ ও উত্তম? তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফিকহশাস্ত্রে এরূপ মতপার্থক্যের সংখ্যাই বেশি। উল্লেখ্য যে, ইমামগণের মধ্যে এ জাতীয় যে মতপার্থক্য দেখা যায়, তা প্রকৃত অর্থে পরস্পর বিরোধী মত নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে, এক ইমামের দৃষ্টিতে যেটা সাহীহ, অপর ইমামের দৃষ্টিতে সেটা বাতিল।

৪. যেমন- নাক থেকে রক্তক্ষরণ হলে অযু নষ্ট হবে কি-না? কারো মতে, এরূপ অবস্থায় অযু ভঙ্গ হবে, অপর কারো মতে, অযু ভঙ্গ হবে না। এ জাতীয় মতপার্থক্য খুব অল্প সংখ্যক মাস'আলার ক্ষেত্রে দেখা যায়।

৫. যেমন- যেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন 'আমাল করার অবকাশ রয়েছে। যথা- কুরআনের বিভিন্ন বিধিবদ্ধ কিরা'আত। হয়তো কোনো কারী কুরআনের এক ধরনের কিরা'আত অনুসরণ করেন; কিন্তু অন্য কিরা'আতগুলোকে অস্বীকার করেন না। এটা প্রকৃতপক্ষে কোনো ইখতিলাফ নয়। কেননা এ কিরা'আতগুলোর প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ হবার ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। এর প্রত্যেকটিই মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত।

করেছেন। যেমন- 'ইখতিলাফ' শব্দটি বিশুদ্ধ দলীলনির্ভর মতানৈক্যের ক্ষেত্রে এবং 'খিলাফ' শব্দটি দলীলবিহীন কিংবা দুর্বল দলীলনির্ভর মতানৈক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী থানবী রহ. বলেন, অগ্রগণ্য (الرَّاجح) মতের বিপরীতে দুর্বল অভিমত (الْمَرْجُوح)কে 'খিলাফ' বলা হয়; 'ইখতিলাফ' বলা হয় না। মোটকথা, 'খিলাফ'-এর ক্ষেত্রে মতভেদকারীর কথা দুর্বল হয়ে থাকে। যেমন- বলা হয় যে, সে ইজমা'র খিলাফ করেছে। পক্ষান্তরে 'ইখতিলাফ'-এর ক্ষেত্রে মতভেদকারীর কথা দুর্বল হয় না।

আবার কারো কারো মতে, 'খিলাফ' শব্দটি 'ইখতিলাফ'-এর চেয়ে ব্যাপকতাজ্ঞাপক। এটি ইজমা'র বিরোধিতার ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি ব্যক্তিবিশেষের মতের বিরোধিতার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।[৬]

ইসলামে ইখতিলাফের বিধান

আল-কুরআনের বহু আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসে সকল মু'মিনকে একত্রিত থাকতে এবং পরস্পর মতপার্থক্য না করতে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো আয়াত ও হাদীসে মতপার্থক্যে লিপ্ত হবার কঠিন পরিণতি সম্পর্কেও লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿... وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾

"... এবং কখনোই মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না, (তাদের মধ্যে এমনও আছে যে,) যারা তাদের দীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং তারা নানা ফেরকায় পরিণত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দলই নিজেদের কাছে যা কিছু রয়েছে, তা নিয়ে উৎফুল্ল।"[৭]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

"আর তোমরা তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। এরাই হচ্ছে সে সব লোক, যাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।"[৮]

---

৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ* (কুয়েতঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ..., ১৪০৪ হি.), খ. ২, পৃ. ২৯১-২
৭. আল-কুরআন, ৩০ : ৩১-৩২
৮. আল-কুরআন, ৩ : ১০৫

তিনি আরো বলেন, ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ "যারা এ কিতাব নিয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে, তারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।"[৯] রাসূলুল্লাহ স. বলেন, وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ - "তোমরা মতবিরোধ করো না। কেননা এতে তোমাদের অন্তরগুলোর মধ্যেও দূরত্ব তৈরি হবে।"[১০] অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন, إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِى الْكِتَابِ- "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো কেবল এ জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা (আল্লাহর) কিতাব নিয়ে মতবিরোধ করতো।"[১১]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, ইসলামে যে কোনো বিষয়ে- চাই তা 'আকীদা সংক্রান্ত ব্যাপার হোক কিংবা 'আমাল সংক্রান্ত হোক- মতবিরোধ করার কোনো নীতিগত ভিত্তি নেই। বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা এবং স্বার্থপ্রণোদিত কিংবা প্রবৃত্তিতাড়িত যে কোনো বিরোধিতা ইসলামের দৃষ্টিতে চরম নিন্দনীয়।

তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, মানুষে মানুষে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, বিচার বিশ্লেষণ একেক জনের একেক রকম। ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতেই পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾

> "আর তোমার রাব্ব চাইলে দুনিয়ার সব মানুষকে একই উম্মাত বানিয়ে দিতে পারতেন। (কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কারো ওপর তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেন না।) আর এভাবে তারা সর্বদাই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে। তবে তোমার রাব্ব যার প্রতি দয়া করেন তার কথা আলাদা।"[১২]

উক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি-বিবেকগত তারতম্যের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে যে মতভিন্নতা দেখা দেয়, তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি নৈপুণ্যের একটি নিদর্শন এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তা ঘটে থাকে। এরূপ মতভিন্নতা দূষণীয় নয়, যদি তা বিশুদ্ধ দলীল ও যুক্তিনির্ভর হয় এবং শিষ্টাচার ও নীতিবিবর্জিত না হয়। ক্ষেত্র বিশেষে তা উপকারীও বটে। আমাদের সালাফে সালিহীন (পূর্বসূরী) দীনের ইজতিহাদী বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন। তবে তাঁদের সে মতপার্থক্যে কোনো প্রকারের জিদ্, হঠকারিতা ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। তাঁরা

---

৯. আল-কুরআন, ২ : ১৭৬

১০. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: তাসবিয়াতুস সুফূফ, হা. নং: ১০০০

১১. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: 'ইলম, পরিচ্ছেদ: আন-নাহয়্যু 'আন মুতাশাবিহিল কুরআন, তাসবিয়াতুস সুফূফ, হা. নং: ৬৯৪৭

১২. আল-কুরআন, ১১ : ১১৮-৯

মতবিরোধ করেছেন তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনার স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে এবং তা ছিল অতি ক্ষণস্থায়ী। ইচ্ছাকৃত কিংবা জিদের বশবর্তী হয়ে তাঁরা কখনো মতবিরোধ করেননি। যতটুকু করেছেন তা প্রয়োজনের তাগিদে একান্ত বাধ্য হয়ে। তাঁরা যথাসাধ্য মতবিরোধ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন এবং যখনই তাঁরা কোনো সঠিক দলীল পেতেন, সাথে সাথে তাঁরা সকলেই প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করে নিতেন। তাঁদের মতবিরোধের পেছনে একান্ত উদ্দেশ্য ছিল, নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে কুর'আন ও হাদীসের ওপর নিজেদের ও উম্মাতের 'আমাল প্রতিষ্ঠা করা এবং এভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাঁদের মতবিরোধ তাঁদের মধ্যে অন্তরের সামান্যতম দূরত্বও তৈরি করেনি, তাঁদেরকে নানা দলে-উপদলে বিভক্তও করেনি। বরং এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে নজীরবিহীন। পরমত সহিষ্ণুতা ছিল তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁদের এরূপ ইজতিহাদভিত্তিক উদারনৈতিক মতপার্থক্য বহু ক্ষেত্রে উম্মাতকে প্রশস্ততাও দান করেছে। এ কারণে অনেকেই তাঁদের এ মতপার্থক্যকে উম্মাতের জন্য রাহমাতরূপেও বিবেচনা করেছেন।[১৩] ইসলামের পঞ্চম খলীফা সাইয়িদুনা 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয রা. সাহাবা কিরাম রা.-এর মতবিরোধ সম্পর্কে বলেন:

ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة

"রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণের মধ্যে মতভিন্নতা না থাকাটা আমার কাছে আনন্দের বিষয় নয়। কেননা, যদি তাঁরা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য না করতেন, তা হলে (পরবর্তীদের জন্য) কোনো ছাড়ই থাকতো না।"[১৪]

অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় উত্তরসূরীরা অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ অবস্থায় পড়ে যেতো। কেননা, যদি তাঁরা সব বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করতেন, তা হলে যে কেউ কোনো বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করলে সে পথভ্রষ্টরূপে পরিগণিত হতো। এখন যেসব বিষয়ে তাঁরা মতানৈক্য করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে- যেহেতু তাঁরা প্রত্যেকেই অনুসরণীয় ইমাম, তাই- প্রত্যেকের জন্য এ অবকাশ রয়েছে যে, তিনি যে কারো অনুসরণ করতে পারেন। এ জন্য অন্তত পক্ষে কাউকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে না। বিশিষ্ট ফাকীহ তাবি'ঈ আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ [৩৭-১০৭ হি.] রহ. বলেন:

كان اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نفع الله به، فما عملت منه من عمل لم يدخل نفسك منه شيء.

---

১৩. ইব্রাহীম শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত* (দারু ইবনি 'আফফান, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৭৫

১৪. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, (http://www.alsunnah.com), খ. ১, পৃ. ৪০৪; ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া* (দারুল ওয়াফা, ২০০৫ খ্রি.), খ. ৩০, পৃ. ৮০

"রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণের মতপার্থক্য আল্লাহ তা'আলার কল্যাণকর বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। তুমি (তাঁদের মধ্যে) যাঁর মতানুযায়ী যে 'আমালই করো না কেন, এতে তোমার মনের মধ্যে কোনো অপ্রসন্ন ভাবসঞ্চার হবে না।"[১৫]

উল্লেখ্য যে, সাহাবা কিরামের ইজতিহাদভিত্তিক মতপার্থক্যের মধ্যে উম্মাতের জন্য প্রশস্ততা রয়েছে এবং তা উম্মাতের জন্য রাহমাতস্বরূপ, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে কথাটি সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু এরূপ সাধারণ সমীকরণ সকলেই মেনে নিতে চান না। যেমন- ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] রহ. বলেন:

لَيْسَ فِي اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَةٌ، وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ ...
لا يكون قولان مختلفان صوابين.

"রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণের মতভিন্নতার মধ্যে কোনোরূপ প্রশস্ততা নেই। হক কেবল যে কোনো একজনের পক্ষেই থাকবে। ...পরস্পর ভিন্ন দুটি মত সঠিক হতে পারে না।"[১৬]

ইমাম লাইছ ইবনু সা'দ [৯৪-১৭৫ হি.] রহ. এর ও অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে।[১৭] কাযী ইসমা'ঈল [২০০-২৮২ হি.] রহ. বলেন:

إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي،
فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا.

"রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণের মতভিন্নতার মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে- এ কথার একান্ত তাৎপর্য হলো, চিন্তা-গবেষণা করে রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা। প্রশস্ততার অর্থ এ নয় যে, লোকেরা তাঁদের যে কারো মত গ্রহণ করবেন, যদিও তাঁর কথায় হক নিহিত না থাকে।"[১৮]

ইবনু 'আবদিল বার্‌র [৩৬৮-৪৬৩ হি.] রহ. বলেন, كلام إسماعيل هذا حسن جدا.- "ইসমা'ঈলের এ কথা অত্যন্ত চমৎকার।"[১৯] একবার আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস

---

১৫. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ১, পৃ. ৪০৪
১৬. শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ৫, পৃ. ৭৫
১৭. ইবনু হাযম, *আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম* (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪০৪ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩১৭; ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম ও ফাদলিহি* (দারু ইবনি হায্‌ম, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৬৪

قال ابن القاسم سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب

১৮. ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *জামি'উ বায়ান*, খ. ২, পৃ. ১৬৪; শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ৫, পৃ. ৭৫
১৯. ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *জামি'উ বায়ান*, খ. ২, পৃ. ১৬৪

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক [১১৮-১৮১ হি.] রহ. কে সাহাবীগণের ইখতিলাফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তাঁদের প্রত্যেকের কথাই কী সঠিক? তখন তিনি জবাব দেন, الصواب واحد، والخطأ موضوع عن القوم، أرجو "সঠিক মত একটিই। তবে আমি আশা করি যে, ভুল মতটি তাঁদের নিকট বিবেচ্য হয়নি।"[২০]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ [৬৬১-৭২৮ হি.] রহ. এ দু ধরনের বক্তব্যের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, মতানৈক্য যেমন কখনো রাহমাতের উপলক্ষ হতে পারে, তেমনি কখনো তা 'আযাবেরও উপলক্ষ হতে পারে। তিনি বলেন:

> النِّزَاعُ فِي الأَحْكَامِ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً إِذَا لَمْ يُفْضِ إِلَى شَرٍّ عَظِيمٍ مِنْ خَفَاءِ الْحُكْمِ. وَالْحَقُّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَاحِدٌ، وَقَدْ يَكُونُ خَفَاؤُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ - لِمَا فِي ظُهُورِهِ مِنَ الشِّدَّةِ عَلَيْهِ - مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِهِ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. وَهَكَذَا مَا يُوجَدُ فِي الأَسْوَاقِ مِنَ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ مَغْصُوبًا، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الإِنْسَانُ بِذَلِكَ كَانَ كُلُّهُ حَلاَلاً لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ بِحَالٍ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا عَلِمَ. فَخَفَاءُ الْعِلْمِ بِمَا يُوجِبُ الشِّدَّةَ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً، كَمَا أَنَّ خَفَاءَ الْعِلْمِ بِمَا يُوجِبُ الرُّخْصَةَ قَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً، كَمَا أَنَّ رَفْعَ الشَّكِّ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً وَقَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً.
>
> "বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে পরস্পর মতানৈক্য কখনো রাহমাত হতে পারে, যদি সঠিক হুকমটি প্রচ্ছন্ন থাকার কারণে তা বড় ধরনের কোনো অনিষ্টের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। বস্তুতপক্ষে হক একটিই। কখনো এ হক প্রচ্ছন্ন থাকার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি রাহমাত হয়ে থাকে। কেননা এ হক সুস্পষ্ট হলে কখনো তাদের কষ্টে নিপতিত হতে হতো। এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী "তোমরা এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যদি তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হয়, তা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।"-এর পর্যায়ভুক্ত। যেমন- বাজারে অনেক খাদ্য ও পোশাক পাওয়া যায়। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এগুলো বাজারে কারো থেকে অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে অজ্ঞাত তাদের জন্য এগুলো হালাল। কিন্তু যারা এ ব্যাপারে অবগত যে, এগুলো অপহৃত সম্পদ, তাদের জন্য এগুলো ক্রয় করা জায়িয হবে না। কাজেই যে জ্ঞান জটিলতা তৈরি করে, তা জানা না থাকলে কখনো রাহমাত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যে জ্ঞান সহজ অবস্থা তৈরি করে, তা জানা না থাকলে কখনো শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে সন্দেহ দূরীকরণও কখনো রাহমাতের উপলক্ষ হয়, আবার কখনো শাস্তির উপলক্ষ হয়।"[২১]

আমরা নিম্নে ইসলামে ফিকহী মতপার্থক্যের উৎপত্তি এবং এর স্বরূপ ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করবো।

---

২০. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ১, পৃ. ৪০৩

২১. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া* (দারুল ওয়াফা, ২০০৫ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. ১৫৯

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে মতপার্থক্য

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে কোনোরূপ মতপার্থক্য দানা বাঁধতে পারেনি। এ সময় যদিও ক্ষেত্রবিশেষে সাহাবা কিরাম রহ.-এর মধ্যেও কিছুটা মতপার্থক্য তৈরি হতো; তবে তাঁর উপস্থিতির সুবাদে এ মতপার্থক্য সহজেই নিরসন হয়ে যেতো। তাঁরা যখনই কোনো সমস্যা বা মতপার্থক্যের সম্মুখীন হতেন, তখন রাসূলুল্লাহ স.-এর শরণাপন্ন হতেন। তিনি তাঁদেরকে সঠিক ফায়সালাটি জানিয়ে দিতেন। তবে তখনকার এরূপ কিছু ঘটনার কথাও জানা যায় যে, সাহাবা কিরাম রা. কোনো অভিযানে মাদীনা থেকে বেশ দূরে অবস্থা করছিলেন এবং এমন সময় তাঁরা এরূপ কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যে, যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে রীতিমত মতপার্থক্য তৈরি হয় এবং তখন এ মতপার্থক্য নিরসনের জন্য তাঁদের পক্ষে মাদীনায় রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসাও সম্ভব হতো না। ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের মতো ইজতিহাদ করে 'আমাল করতেন। পরে যখন তাঁরা মাদীনায় ফিরে আসতেন, তখন তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ স.কে ঘটনাটি জানাতেন এবং সে সাথে তাঁদের নিজেদের ইজতিহাদগুলোও পেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ স. ঘটনাটির পুরো বৃত্তান্ত শুনে হয়তো তাঁদের ইজতিহাদগুলো বহাল রাখতেন অথবা সঠিক ফায়সালাটি জানিয়ে দিতেন। সাহাবা কিরাম রা. সঠিক ফায়সালাটি জেনে খুশি হতেন এবং এভাবে তাঁদের মধ্যকার মতপার্থক্যও নিরসন হয়ে যেতো। নিম্নে এরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা আলোচনা করা হলো:

ক. সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ স. সাহাবীদের বললেন, لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ "তোমাদের কেউ যেন বানূ কুরাইযা পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় না করে।" পথে সালাতুল 'আসরের সময় শেষ হওয়ার উপক্রম হলে একদল সাহাবী বললেন, এমনকি সময় পার হয়ে গেলেও বানূ কুরাইযায় পৌঁছার পূর্বে আমরা সালাত আদায় করবো না। অপর একদল সাহাবী বললেন, আমরা পথিমধ্যেই সময়মতো সালাত আদায় করবো। কেননা সালাত কাযা করানো রাসূলুল্লাহ স.-এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমাদের গতি দ্রুত করাই ছিল তাঁর একান্ত উদ্দেশ্য, যাতে সালাতুল আসরের পূর্বে সেখানে পৌঁছা যায়। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি।[২২]

---

২২. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ: মারজি'উন্নাবী সা. মিনাল আহযাব হা. নং: ৩৮৯৩

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: " لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

হাফিয 'আবদুর রাহমান আস-সুহাইলী [৫০৮-৫৮১ হি.] রহ. ও অন্যান্য বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়,

এক. আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করা যেমন দূষণীয় নয়, তেমনি ইজতিহাদের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করাও নিন্দনীয় নয়।

দুই. শারীআহের অপ্রধান বিষয়সমূহে মুজতাহিদগণের সকলেই সঠিক। তাঁদের কাউকেই ভ্রান্ত বলা যাবে না।[২৩] কাজেই মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে পরস্পরের বিভাজনকে রাসূলুল্লাহ স. ভালো চোখে দেখেননি। তিনি এরূপ আচরণের নিন্দা করেছেন।

খ. সাইয়িদুনা 'আমর ইবনুল 'আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাতুল সালাসিল যুদ্ধের সময় এক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। এ সময় আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, যদি আমি গোসল করি তাহলে আমি মরে যাবো। ফলে আমি তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফাজরের নামায আদায় করি। অভিযান থেকে ফিরে এসে তাঁরা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ স. কে অবহিত করেন। তিনি এটা শোনে বললেন, "হে 'আম্‌র! তুমি অপবিত্র অবস্থায় সাথীদের নিয়ে নামায পড়লে?!" তখন আমি তাঁকে গোসল না করার কারণ জানালাম এবং বললাম যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "তোমাদের নিজেদের মেরে ফেলো না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" এ কথা শোনে রাসূলুল্লাহ স. হাসলেন; কিছু বললেন না।[২৪]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যদিও 'আমর ইবনুল 'আস রা.-এর উক্ত ইজতিহাদ সাহাবীগণের নিকট পছন্দনীয় হয়নি এবং এ কারণে তাঁরা মাদীনায় ফিরে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ স.কে অবহিত করেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ স. 'আমর ইবনুল 'আস রা.-এর বক্তব্য শোনে তাঁর ইজতিহাদ অনুমোদন করলেন। এ থেকে অনেক উসূলবিদই মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণের ইজতিহাদ করে আমাল করা জায়িয ছিল।[২৫]

---

২৩. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), খ. ৭, পৃ. ৪০৯

২৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায়ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদঃ ইযা খাফাল জুনুবু আল্‌বারদা.., হা. নং: ৩৩৪

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِى الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ». فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى مَنَعَنِى مِنَ الاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّى سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

২৫. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৫৪; বাদরুদ্দীন আল-'আইনী, *শারহু সুনানি আবী দাউদ* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৫০

গ. সাইয়িদুনা আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার দুজন ব্যক্তি সফরে বের হন। পথিমধ্যে তাঁদের নামাযের সময় হয়। কিন্তু তাঁদের সাথে অযু করার মতো কোনো পানি ছিল না। ফলে তাঁরা দুজনেই পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেন। এরপর নামাযের সময়ের মধ্যে তাঁরা দুজনেই পানি পেলেন। ফলে তাঁদের একজন অযু করে পুনরায় নামায আদায় করলেন; কিন্তু অপর ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়লেন না। পরবর্তীতে তাঁরা দুজনেই রাসূলুল্লাহ স.-এর খিদমাতে এসে তাঁকে তাঁদের উক্ত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ স. যিনি পুনরায় নামায পড়ে দেননি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ. "তুমি সঠিক নিয়মই পালন করেছো। তোমার ঐ নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" আর যিনি অযু করে পুনরায় নামায পড়ে দেন রাসূলুল্লাহ স. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. "তোমার জন্য দুবারই পুরস্কার রয়েছে।"[২৬]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাঁরা দুজনেই নিজে নিজে ইজতিহাদ করে 'আমাল করেন এবং তা নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে মতভিন্নতাও দেখা দেয়। কিন্তু পরে রাসূলুল্লাহ স. তাঁদের মতপার্থক্যের কথা জানতে পেরে তাঁদের কাউকে তিরস্কার তো করলেনই না; বরং তাঁদের প্রত্যেকের 'আমাল অনুমোদন করলেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণ ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদ করে আমাল করতেন এবং তা নিয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্যও দেখা দিতো। পরে রাসূলুল্লাহ স. তাঁদের মতপার্থক্যের কথা জানতে পেরে তাঁদের প্রত্যেকের 'আমাল অনুমোদনও করতেন।

ঘ. সাইয়িদুনা জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমাদের জনৈক সাথীর মাথা ফেটে যায়। পরবর্তীতে তার গোসল ফারয হলে তিনি এ অবস্থায় তায়াম্মুম করার কোনো সুযোগ আছে কি-না জানতে চাইলেন। সাথীরা বললো, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহার করতে পারছো, তাই তোমার তায়াম্মুম করার কোনো সুযোগ নেই। তখন তিনি বাধ্য হয়ে গোসল করলেন। এতে তাঁর মৃত্যু হলো। আমরা মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ স.কে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি তাঁর সাথীদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে বললেন, قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السوال "তারা তাকে খুন

---

২৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: তাহারাত, পরিচ্ছেদ: আল-মুতাইয়াম্মিম ইয়াজিদুল মা'আ.., হা. নং: ৩৩৮

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ « أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ ». وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ « لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ».

করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করুন! জানা না থাকলে তারা জিজ্ঞাসা করে নিলো না কেন? জিজ্ঞাসাই তো হলো অজ্ঞতার নিরাময়। তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে তায়াম্মুম করবে অথবা ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধবে এবং তার ওপর মাসহ করবে আর শরীরের অন্যান্য অংশ ধুয়ে ফেলবে।"[২৭]

এ হাদীস থেকেও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণ ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদ করে আমাল করতেন। তবে তিনি এরূপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের ইজতিহাদকে অনুমোদন দেননি। বিশেষ করে যাঁদের ইজতিহাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই, তাঁরা নিজেরা ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত দেবেন- এটা তিনি মোটের ওপর পছন্দ করতেন না। বরং তাঁদের একান্ত কর্তব্য হলো, বিজ্ঞ 'আলিমের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁদের কথা মেনে চলা।[২৮]

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে মতপার্থক্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

ইতঃপূর্বে রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে মতপার্থক্যের যে অবস্থা আলোচনা করা হলো, তার আলোকে আমরা তাঁর সময়কার মতপার্থক্যের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরতে পারি।

ক. সাহাবা কিরাম রা. যথাসাধ্য মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন। এ কারণে তাঁরা ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে- এমন সব বিষয় ও খুঁটিনাটি ব্যাপার এড়িয়ে যেতেন। তাঁরা কেবল বাধ্য হয়েই সময়ে সময়ে আপতিত বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনাতে নিজেদের করণীয় জানতে চেষ্টা করতেন। এর ফলে আপতিত ঘটনার তাৎক্ষণিক সমাধান বের করার প্রয়োজনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তো দূরের কথা, পরস্পর মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ার সুযোগও তাঁদের বেশি ছিল না।

খ. মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি তাঁদের মধ্যে ঘটনাক্রমে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিতো, তখন তাঁরা দেরি না করে দ্রুত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ স.-এর শরণাপন্ন হতেন। এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের মতবিরোধ নিরসন হয়ে যেতো।

---

২৭. দারাকুতনী, *আস-সুনান,* অধ্যায়ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদঃ জাওয়াযুত তায়াম্মুম লি-সাহিবিল জিরাহ..., খ. ১, পৃ. ১৮৯, হা. নংঃ ৬৪/৩; বাইহাকী, আস-সুনানুস সুগরা, অধ্যায়ঃ তাহারাত, পরিচ্ছেদঃ আত-তায়াম্মুম, হা. নংঃ ১৮১

عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون في رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السوال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده.

২৮. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,* খ. ২, পৃ. ৩৫৩

গ. যে কোনো বিরোধের সময় তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতেন এবং পরিপূর্ণরূপে তা মেনে চলতেন।

ঘ. অনেক ব্যাখ্যানির্ভর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ স. মতবিরোধকারীদের পরস্পর ভিন্ন সব মতকেই সঠিক বলে অনুমোদন দেন। এতে প্রত্যেকেরই এ ধারণা লাভ হতো যে, তিনি যে মত পোষণ করেছেন তা যেমন সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তেমনি তাঁর অপর ভাইয়ের মতও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। বস্তুতপক্ষে এ ধারণা মতবিরোধকারীদের প্রত্যেককে একে অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শিক্ষা দেয় এবং নিজের মতের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে।

ঙ. সাহাবীগণের মতবিরোধের পেছনে সকলের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল, নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে সত্য বের করা ও তার ওপর 'আমাল করা। তাঁদের সে মতবিরোধে কোনো প্রকারের স্বার্থপরতা, আত্মপ্রীতি, হঠকারিতা ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না।

চ. সাহাবীগণ মতবিরোধের ক্ষেত্রে কখনো ইসলামের সাধারণ শিষ্টাচার-রীতি লঙ্ঘন করতেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের অভিমত যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতেন, একে অপরের মত গভীর মনোযোগ সহকারে শোনতেন, সুন্দর ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করতেন এবং যে কোনোভাবে কটাক্ষ করা থেকে বিরত থাকতেন।

সাহাবা কিরাম ও মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে মতপার্থক্য

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে যেমন ফিকহী বিষয়ে ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদী মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবা কিরামের আমলেও এরূপ মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল। তদুপরি এসময়কার অনেক বিষয়ের মতপার্থক্য অমীমাংসিতও থেকে যায়। যেমন- সালাত আদায় তরককারীর কাফির হওয়া বা না-হওয়া, গোসলে মহিলাদের মাথার খোপা খোলা বা না-খোলা, গর্ভবতী নারী বিধবা হলে 'ইদ্দাতের সময়কাল কতটুকু হবে প্রভৃতি বিষয়গুলো সাহাবা কিরামের আমলেও অমীমাংসিত ছিল। সাহাবা কিরাম রা.-এর পর মুজতাহিদ ইমামগণও কুর'আন ও হাদীস এবং নিজস্ব কতিপয় মূলনীতি অনুসরণ করে নানা বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন এবং তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্যও দেখা দেয়। কিন্তু সাহাবা কিরাম রা. ও মুজতাহিদ ইমামগণের এ মতপার্থক্যের মধ্যে আমরা কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও শিষ্টাচার দেখতে পাই। যেমন-

ক. নিজের মতকে একমাত্র সঠিক মনে না করা

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও শারী'আতের অপ্রধান বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন; কিন্তু তাঁদের কেউ নিজের মতকে একমাত্র সঠিক মত এবং অন্যান্যের মতকে ভ্রান্ত

মনে করতেন না। বরং তাঁদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি হতো এই যে, তাঁর মতটি তাঁর গবেষণা ও চিন্তা অনুযায়ী সঠিক; কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। অপরদিকে অন্যের মতটি তাঁর গবেষণা ও চিন্তা অনুযায়ী ভুল; কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। এ কারণে মুজতাহিদ ইমামগণ তাঁদের মতামত খুব কমই দৃঢ়তাসূচক ভাষায় ব্যক্ত করে থাকেন; বরং আমরা তাঁদেরকে প্রায়শ নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে এ কথা বলতে দেখতে পাই যে, هذا أحوط (এটা অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা), هذا أصح (এটা অধিকতর বিশুদ্ধ), هذا أحسن (এটা অধিকতর উত্তম), هذا أولى (এটা অধিকতর উপযোগী), هذا ما ينبغي (এটা সমীচীন), نكره هذا (এটা আমরা অপছন্দ করি), لايعجبني (এটা আমার পছন্দনীয় নয়) প্রভৃতি। বিশিষ্ট সাহাবীগণের নিয়ম ছিল যে, তাঁরা যখনই কোনো বিষয়ে নিজের রায় ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো ফাতওয়া দিতেন, তখন বলতেন:

إن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشّيطان؛ والله ورسوله منه بريء

"যদি তা সঠিক হয়, তবেই তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হয়, তবে তা আমার ও শায়তানের পক্ষ থেকে এবং তা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দায়মুক্ত।"[২৯]

একবার ইমাম মালিক রহ.কে সাহাবী কিরাম রহ.-এর মতপার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি জবাব দেন, خطأ وصواب، فانظر في ذلك. "তাঁদের ইজতিহাদ ভুলও হতে পারে এবং সঠিকও হতে পারে। কাজেই তাঁদের (ইজতিহাদভিত্তিক) মতের মধ্যে চিন্তা-ফিকর করো।"[৩০] ইমাম মালিক রহ. নিজের ইজতিহাদ সম্পর্কে অকুণ্ঠ চিত্তে বলেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أخطِئ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي؛ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ.

"আমি নিছক একজন মানুষ। ভুলও করতে পারি, ঠিকও করতে পারি। অতএব, তোমরা আমার মত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে। যদি দেখো যে, আমার

---

২৯. এ উক্তি করেছেন সাইয়িদুনা আবূ বাক্র (দ্র. দারিমী, *আস-সুনান*, হা. নং: ২৯৭২; বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ১২৬২৯), 'উমার (দ্র. বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ২০৮৪৫; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা. নং: ২৭৩৭) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (দ্র. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হা. নং: ২১১৮; দারাকুতনী, *আস-সুনান*, হা. নং: ১৬৫; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫) এ ছাড়াও অন্যান্য অনেকের থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে।

৩০. হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুকতাবাস*..., (http://www.alwarraq.com), পৃ. ২৯; ইবনু হাযম, *আল-ইহকাম*, খ. ৬, পৃ. ৩১৭

কোনো মত কুর'আন ও হাদীসের সাথে পুরো সঙ্গতিপূর্ণ, তবেই তা গ্রহণ করো। আর যদি দেখো যে, আমার কোনো মত কুর'আন ও সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা হলে তোমরা তা ছেড়ে দেবে।"[৩১]

ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী আল-হানাফী [মৃ. ৭১০ হি.] রহ. বলেন:

إذَا سُئِلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ مُخَالِفِنَا قُلْنَا وُجُوبًا: مَذْهَبُنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبُ مُخَالِفِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ. وَإِذَا سُئِلْنَا عَنْ مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا. قُلْنَا وُجُوبًا الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومُنَا.

"আমাদের ও আমাদের প্রতিপক্ষের ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হলে আমরা অবশ্যাম্ভাবীরূপে বলবো, আমাদের মাযহাবই সঠিক, তবে ভুল হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর আমাদের প্রতিপক্ষের মাযহাব ভুল, তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু আমাদের ও আমাদের প্রতিপক্ষের 'আকীদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অবশ্যাম্ভাবীরূপে বলবো যে, আমাদের 'আকীদাই সঠিক এবং প্রতিপক্ষের 'আকীদা ভ্রান্ত।"[৩২]

অর্থাৎ ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার সুনিশ্চিত দাবি করা সম্ভব নয়। কেননা সেক্ষেত্রে অনেক সময় প্রমাণাদি হয় প্রচ্ছন্ন, দ্ব্যর্থবোধক কিংবা দুর্বল। পক্ষান্তরে 'আকীদার ক্ষেত্রে প্রমাণাদি হচ্ছে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও শক্তিশালী। সুতরাং এতে ভিন্নমতের কোনোই অবকাশ নেই। ইমাম নাসাফী রহ.-এর উপর্যুক্ত কথার ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ ইবনু 'আবিদীন [১১৯৮-১২৫২ হি.] রহ. বলেন:

فَلا نَجْزِمُ بِأَنَّ مَذْهَبَنَا صَوَابٌ أَلْبَتَّةَ وَلا بِأَنَّ مَذْهَبَ مُخَالِفِنَا خَطَأٌ أَلْبَتَّةَ، بِنَاءً عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ طَلَبُهُ. فَمَنْ أَصَابَهُ فَهُوَ الْمُصِيبُ وَمَنْ لا فَهُوَ الْمُخْطِئُ.

"আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি না যে, আমাদের মাযহাবই অবশ্যাম্ভাবীরূপে সঠিক এবং আমাদের প্রতিপক্ষের মাযহাব অবশ্যাম্ভাবীরূপে ভুল। কেননা পছন্দনীয় মত হলো- প্রতিটি মাস'আলায় আল্লাহ তা'আলার বিধান একটিই এবং তা সুনির্দিষ্ট, যা অনুসন্ধান করে বের করা ওয়াজিব। কাজেই যিনি উক্ত একক ও সুনির্দিষ্ট বিধানটি সঠিকভাবে আহরণ করতে সমর্থ হবেন, তিনিই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত। পক্ষান্তরে যিনি উক্ত একক ও সুনির্দিষ্ট বিধানটি সঠিকভাবে আহরণ করতে সমর্থ হননি, তিনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত।"[৩৩]

---

৩১. ইবনু হায্ম, *আল-ইহকাম*, খ. ৬, পৃ. ৭৯০; বাদরুদ্দীন আয-যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২০০

৩২. ইবনু নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযা'য়ির* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৮১; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* (http://www.al-islam.com), খ. ১, পৃ. ১১৫

৩৩. *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১৬

মুফতী ইবনু মুল্লা ফাররূখ আল-হানাফী [মৃ. ১০৫২ হি.] রহ. বলেন:

الكل كانوا في طلب الحق على حد متساو واجتهاد كل واحد منهم يحتمل الخطأ كغيره بعد تسليم بلوغهم درجة الاجتهاد وإن تفاوتوا فيه

"সকলেই তাঁরা সমানভাবে সত্যানুসন্ধানে রত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই ইজতিহাদ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এটা স্বীকার্য যে, তাঁরা প্রত্যেকেই ইজতিহাদের মর্যাদা লাভ করেছেন, যদিও তাঁদের মধ্যে যোগ্যতাগত পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।"[৩৪]

ইমাম ইবনু আমীরিল হাজ্জ আল-হানাফী [মৃ. ৬৬৯-৭৩৩ হি.] রহ. বলেন:

إن رأيه يحتمل الخطأ وإن كان الظاهر عنده أنه الصواب ورأي غيره يحتمل الصواب وإن كان الظاهر عنده خطأه

"তাঁর (ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর) অভিমতও ভুল হবার সম্ভাবনা রাখে, যদিও তা বাহ্যত তাঁর নিকট সঠিক এবং অপরদিকে অন্যের মত সঠিক হবার সম্ভাবনা রাখে, যদিও তা বাহ্যত তাঁর নিকট ভুল।"[৩৫]

খালীফা হারূনুর রাশীদ ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট থেকে 'মুওয়াত্তা' শোনে আরয করলেন, আমি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ইমাম মালিক রহ. বললেন, সিদ্ধান্তটি কী? খালীফা বললেন, আমি মুওয়াত্তাটি কা'বার গাত্রে ঝুলিয়ে দেবো এবং প্রত্যেক দেশেই এর এক একটি কপি পাঠিয়ে দেবো। তদুপরি উম্মাতের ঐক্যের স্বার্থে সকলকে এটা মেনে চলতে এবং এ ছাড়া অন্য মাযহাব ত্যাগ করতে নির্দেশ দেবো। সম্মানিত পাঠক ভাইয়েরা, লক্ষ্য করুন! খালীফা হারূনুর রাশীদের এ আরযের জবাবে ইমাম মালিক রহ. কী বললেন! তিনি জবাব দিলেন, "না, আমীরুল মু'মিনীন! এ জাতীয় কোনো কাজ করবেন না।" খালীফা জানতে চাইলেন, কেন? ইমাম মালিক রহ. বললেন:

إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، وحدث كل بما سمع من رسول الله، واستقر عمل كل مصر على ما بلغهم عن رسول الله، فلا تغير على الناس ما هم عليه.

"রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন তা-ই বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু, প্রত্যেকে দেশের 'আমাল সে-ই অবস্থার ওপরই স্থিতিশীলতা লাভ করেছে, যা

৩৪. ইবনু মুল্লা ফাররূখ, *আল-কাওলুস সাদীদ ফী বা'দি মাসা'য়িলিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ* (কুয়েত: দারুদ দা'ওয়াহ, ১৯৮৮), পৃ. ৫০-৫১

৩৫. ইবনু আমীরিল হাজ্জ, *আত-তাকরীরু ওয়াত তাহবীরু ফী 'ইলমিল উসূল* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৪২

রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে তাদের কাছে পৌছেছে। কাজেই আপনি লোকদেরকে তাদের স্ব স্ব অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন না।"[৩৬]

এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে অনেক বিষয়ে অন্যান্য ইমামের মতানৈক্য রয়েছে- কিন্তু খালীফা যখন তাঁর মাযহাবটি রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বত্র চালু করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তিনি তাতে সম্মত হলেন না; বরং তিনি লোকদেরকে তাদের স্ব স্ব অবস্থানের ওপর বহাল রাখতে নির্দেশ দিলেন।

খ. অপরের মতকে শ্রদ্ধা করা

মুজতাহিদ ইমামগণ কুর'আন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি- এরূপ ইজতিহাদ ও গবেষণাধর্মী বিষয়গুলো নিয়ে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন; কিন্তু এ মতবিরোধের কারণে তাঁদের মধ্যে কখনো দেখা দেয়নি দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও বিভাজন। বরং তাঁরা একে অপরের মত ও ইজতিহাদকে সমীহ করতেন। সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাঁদের পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে অনেকেই নামাযের মধ্যে বিসমিল্লাহ পড়তেন, আবার অনেকেই পড়তেন না; কেউ তা উচ্চস্বরে পড়তেন, আবার কেউ অনুচ্চস্বরে পড়তেন; কেউ ফাজরের নামাযের মধ্যে কুনূত পড়তেন, আবার কেউ পড়তেন না; কেউ রক্তমোক্ষণ ও নাক থেকে রক্তক্ষরণের কারণে অযু করতেন, আবার কেউ অযু করতেন না; কেউ পুরুষাঙ্গ ও কামভাবসহকারে নারীকে স্পর্শ করার কারণে অযু করতেন, আবার কেউ অযু করতেন না; কেউ আগুনে সিদ্ধ খাবার খেলে অযু করতেন, আবার কেউ করতেন না; কেউ উটের গোশত খেলে অযু করতেন, আবার কেউ করতেন না। এতদসত্ত্বেও তাঁরা একজন অপরজনের পেছনে নামায পড়তেন। যেমন- ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর শিষ্যগণ, অনুরূপভাবে ইমাম শাফি'ঈ ও তাঁর অনুসারী ফাকীহগণ মাদীনাবাসী মালিকী মতাবলম্বী ও অন্যান্য ইমামগণের পেছনে নামায পড়তেন, যদিও বা তাঁরা আদপেই নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তেন না, না অনুচ্চস্বরে, না উচ্চস্বরে।[৩৭]

নিম্নে উদাহরণস্বরূপ এরূপ কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা হলো-

খ.১. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর মতে, নাক থেকে রক্তক্ষরণ হলে কিংবা রক্তমোক্ষণ করলে অযু ভেঙ্গে যায়। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, যাদের মাযহাবে এরূপ অবস্থায় অযু ভাঙ্গে না, তাদের পেছনে কী আপনি নামায পড়বেন?

---

৩৬. 'আতিয়্যাহ, *শারহুল আরবা'ঈন লিন-নাবাবী,* (http://www.islamweb.net), পৃ. ৭

৩৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ* (বৈরূতঃ দারুন নাফা'য়িস, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১১০ ও *হুজ্জাতুল্লাহ বালিগাহ* (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল হাদীছাহ), পৃ.৩৩৫; ইবনু মুল্লা ফাররূখ, *আল-কাওলুস সাদীদ,* পৃ. ১৪০-২

জবাবে তিনি বললেন, كيف لا أصلي خلف الامام مالك وسعيد بن المسيب "কেন নয়? ইমাম মালিক ও ইমাম সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ. প্রমুখের পেছনে কেন নামায পড়বো না?!"[৩৮] উল্লেখ্য যে,তাঁদের মাযহাব মতে, এরূপ অবস্থায় অযু ভঙ্গ হয় না।

খ. ২. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর মতে, উটের গোশত খেলে অযু ভেঙ্গে যায়। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কী ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর পেছনে নামায পড়বেন, যদি তিনি উটের গোশত খেয়ে নামাযে দাঁড়ান? জবাবে তিনি বললেন, وكيف لا أصلي خلف الشافعي وخلف مالك بن أنس وخلف فلان وفلان؟! "কেন নয়? ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক এবং অন্যান্য ইমামের পেছনে কেন নামায পড়বো না?!"[৩৯]

ইমাম আহমাদ রহ.-এর উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো থেকে দুটি বিষয় জানা যায়।

এক. কোনো মাযহাবই ভ্রান্ত নয়। কেননা, সকল মুজতাহিদের মাযহাব ও ইজতিহাদের মূল দলীল হচ্ছে কুর'আন, হাদীস ও কিয়াস।

দুই. পরস্পরের মতামত ও ইজতিহাদের প্রতি ইমামগণের শ্রদ্ধাবোধ ছিল পুরোমাত্রায় এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে সত্যের একনিষ্ঠ অনুসারী মনে করতেন।

খ.৩. ইমাম শাফি'ঈ রহ. একবার ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কাবরের নিকট ফাজরের নামায আদায় করেন। তাঁর মতে, ফাজরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়া আবশ্যক হলেও তিনি এই বলে কুনূত পড়া বাদ দেন যে, এই কাবরবাসী ইমাম ফাজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না। তাই আমি আজ তাঁর প্রতি আদব রক্ষা করতে চাই।[৪০] তিনি আরো বলেন, ربما انحدرنا الى مذهب أهل العراق "কখনো আমরা ইরাকবাসীদের অনুসৃত মাযহাবের দিকে নেমে আসি।"[৪১] অনেকের মতে, সেদিন তিনি উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়েননি। কেননা, আবূ হানীফা রহ. অনুচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন।[৪২]

খ.৪. একবার ইমাম আবু ইউসূফ রহ. হাম্মামখানায় গোসল করে জুমু'আর নামাযের ইমামতি করলেন। নামাযের অনেক পরে জানা গেলো যে, হাম্মাম খানার কূপের মধ্যে একটি ইঁদুর মৃতাবস্থায় পড়ে আছে। হানাফী মাযহাব মতে, এ অবস্থায় পানি অপবিত্র বিধায় নামায পুনরাবৃত্তি করা দরকার; কিন্তু লোকজন চলে যাওয়ায় তা সম্ভব ছিল না।

---

৩৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ*, পৃ. ১১০ ও *হুজ্জাতুল্লাহ বালিগাহ*, পৃ. ৩৩৫; ইবনু মুল্লা ফাররূখ, আল-কাওলুস সাদীদ, পৃ. ১৪২

৩৯. 'আতিয়্যাহ, *শারহুল আরবাঈন*, পৃ. ৬, ১২

৪০. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ*, পৃ. ১১০ ও *হুজ্জাতুল্লাহ বালিগাহ*, পৃ. ৩৩৫

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. মুহাম্মাদ যাকারিয়া, *আওজাযুল মাসালিক*, খ. ১, পৃ. ১০৩

তখন তিনি বললেন:

إذا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا -

"এ মুহূর্তে আমরা আমাদের মাদানী ভাইদের মত অনুসরণ করবো। তাঁদের মতে, দু মটকা পরিমাণ পানিতে নাপাক পড়লে তা অপবিত্র হয় না।"[৪৩]

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. মাদীনার ইমাম মালিক রহ. ও তাঁর অনুসারীগণকে ভাই বলে বোঝাতে চাইলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা উভয় পক্ষই কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করেছি এবং নিজ নিজ চিন্তা ও ইজতিহাদ মুতাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। সুতরাং আমরা সকলেই হকের ওপর রয়েছি। যেহেতু আমাদের উভয় পক্ষের উৎস কুরআন ও হাদীস, তাই আমরা একই মায়ের দুটি সন্তান তুল্য। আরো লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, একজন মুজতাহিদের জন্য সংকটকালে অন্য ইমামের মতের ওপর 'আমাল করার যে সুযোগ রয়েছে, আলোচ্য ঘটনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া একাধিক মাযহাবের উপস্থিতি সংকটকালে শারী'আতের ওপর 'আমাল করার ক্ষেত্রে যে প্রশস্ততা ও সহজতা এনে দেয়, তাও এ ঘটনা থেকে জানা যায়।

গ. দলীল পাওয়া গেলে নিজের অবস্থান প্রত্যাহার করা

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও নানা বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন; কিন্তু তাঁদের এ মতবিরোধের পেছনে তাঁদের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে খোঁজে বের করা। এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ স্বার্থপরতা ও হঠকারিতা তাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। যখনই তাঁদের মতের বিপরীত কোনো সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ দলীল পেতেন, তখনই তাঁরা প্রসন্নচিত্তে নিজের মত পরিত্যাগ করে প্রাপ্ত দলীল অনুযায়ী মত পরিবর্তন করে নিতেন। বিশিষ্ট তাবি'ঈ তা'উস [৩৩-১০৬ হি.] রহ. বলেন, رُبَّمَا رَأَى ابْنُ عَبَّاس الرَّأْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ "ইবনু 'আব্বাস অনেক সময় (ক্ষেত্রবিশেষে) একটি মত পোষণ করতেন। কিছু দিন পর দেখা যেতো, তিনি ঐ মতটি ত্যাগ করেছেন।"[৪৪] *'হিদায়াহ'* গ্রন্থের বিশিষ্ট ভাষ্যকার ইবনুশ শিহ্‌নাহ আল-হালাবী আল-হানাফী [৭৪৯-৮১৫হি.] রহ. বলেন:

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَكَانَ عَلَى خلاف الْمَذْهَبِ عُمِلَ بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَلَا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ.

"যদি মাযহাবের বিপরীত কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায়, তবে হাদীস অনুযায়ীই 'আমাল করা হবে। অধিকন্তু ঐ হাদীসটিই হবে ইমাম আবূ হানীফা

---

৪৩. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৮৯; আবূ সা'ঈদ আল-খাদিমী, *বারীকাতুন মাহমূদিয়াতুন...*, (http://www.al-islam.com), খ. ৬, পৃ. ৩৩৪-৫; শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ*, পৃ. ১০৯; ইবনু মুল্লা ফাররূখ, *আল-কাওলুস সাদীদ*, পৃ. ১০৪

৪৪. দারিমী, *আস-সুনান*, আল-মুকাদ্দামাহ, পরিচ্ছেদ: ইখতিলাফুল ফুকাহা', হা. নং: ৬৩০

রহ.-এর মাযহাব এবং ঐ হাদীসের মর্মানুযায়ী 'আমালকারী ব্যক্তি হানাফী মাযহাব থেকে বহির্ভূত হবে না।"[৪৫]

ইমাম আবূ হানীফাহ রহ.-এর মতেও, যদি কোনো বিষয়ে তাঁর ফায়সালার বিপরীত কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায়, তা হলে তাঁর ফায়সালা ছেড়ে হাদীসের মর্মানুযায়ী 'আমাল করতে হবে। তিনি বলেছেন যে, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي. "যদি হাদীস বিশুদ্ধ হয়, তবে তা-ই হবে আমার মাযহাব।"[৪৬] ইমাম শাফি'ঈ রহ.ও বলেন, وَإِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ، فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الحَائِطَ. "যদি হাদীস সাহীহ হয়, তা হলে তোমরা আমার কথাকে দেওয়ালে নিক্ষেপ করো।"[৪৭] নিম্নে উদাহরণস্বরূপ ইমামগণের নিজের মত থেকে ফিরে আসার কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা হলো-

গ. ১. ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ফাতওয়া হলো, কোনো জিনিস ওয়াক্‌ফ করার পর সেটা তার ওপর আবশ্যক হয়ে যায় না; বরং সে যে কোনো সময় ওয়াক্‌ফকৃত জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে। অবশ্যই যদি সেটা অসিয়্যাতের পর্যায়ের হয় কিংবা শরয়ী কাযীর পক্ষ থেকে ফায়সালাকৃত হয়, তখন আর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে না। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর এ ফাতওয়া ছিল জুমহূর ইমামগণের পরিপন্থী এবং সাহীহ হাদীসের[৪৮] বিপরীত। এর কারণ, হয়তো তাঁর

---

৪৫. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*,খ. ১, পৃ. ১৬৬

৪৬. *প্রাগুক্ত*

৪৭. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮), পৃ. ১৬৫; ইবনুল 'ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), খ. ৪, পৃ. ৯৯

৪৮. হাদীসটি হলো-

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه و سلم (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره). فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو أن يوكل صديقه غير متمول به .

"ইবনু 'উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স.-এর সময় 'উমার রা. নিজের কিছু সম্পত্তি সাদাকাহ করেছিলেন। তা ছিল, ছামগ নামে একটি খেজুর বাগান। 'উমার রা. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি সম্পদ পেয়েছি, যা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়। আমি এটা সাদাকাহ করতে চাই। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, মূল সম্পত্তিটি এ শর্তে সাদাকাহ করো যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কেউ ওয়ারিশও হবে না; বরং তার ফল (আল্লাহর পথে) দান করা হবে। তারপর 'উমার রা. সে সম্পত্তিটি সেভাবে সাদাকাহ করলেন। তাঁর এ সাদাকাহ ব্যয় হবে আল্লাহর রাস্তায়, দাস মুক্তির ব্যাপারে, মিসকীন, মেহমান, মুসাফির ও আত্মীয়দের জন্য। এর যে মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সঙ্গত পরিমাণ আহার করলে কিংবা বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ালে কোনো দোষ নেই। তবে সে তা সঞ্চয় করতে পারবে না।" (বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: আল-ওসায়া, হা. নং: ২৬১৩)

নিকট এতদসংক্রান্ত হাদীসটি পৌছেনি। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. ও প্রথমদিকে তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফাহ্ রহ.-এর ন্যায় মত পোষণ করতেন। কিন্তু যখন তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হলেন এবং মাদীনায় লোকদেরক তাঁদের জায়গা-সম্পত্তি ওয়াক্ফ করতে দেখলেন, তখন তিনি নিজের মত থেকে ফিরে আসেন এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, "এমন স্পষ্ট ও সাহীহ্ হাদীসের বিপরীত মত পেশ করার অধিকার কারো নেই। ইমাম আবূ হানীফাহ্ রহ. ও এ হাদীস পেলে বিপরীত মত পোষণ করতেন না।"[৪৯]

গ.২. একবার ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. খালীফা হারূনুর রাশীদের সাথে মাদীনায় আসেন এবং ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সময় সা'-এর পরিমাণ নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. ইমাম মালিক রহ. কে উদ্দেশ্য করে বললেন, সা'-এর পরিমাণ কতো? তিনি জবাব দেন, আমাদের নিকট সা'-এর পরিমাণ হলো- পাঁচ সমস্ত তিনভাগের এক রিতল। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. বলেন, কিন্তু আমাদের নিকট হলো- সা' হলো আট রিতল। আমাদের ইমাম আবূ হানীফাহ রহ. এরূপ মতই ব্যক্ত করেছেন। তখন ইমাম মালিক রহ. সভায় উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার কাছে রাসূলুল্লাহ স.-এর সময় থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে -এরূপ কোনো সা' বিদ্যমান রয়েছে সে যেন তা আগামীকাল নিয়ে আসে। পরদিন প্রত্যেকেই নিজের চাদরের নিচে এক একটি সা' নিয়ে এসে হাজির হলো এবং কেউ বললো, আমার মা তার নানী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা এ সা' দিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, আবার কেউ বললো, আমার পিতা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ বললো, আমার চাচা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ বললো, আমার মামা অমুক থেকে বর্ণনা করেছেন।... এভাবে সেদিন ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট প্রায় ৫০টি সা' জমা পড়লো। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. বললেন, আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, সা'গুলো প্রায় একই মাপের। আমি তন্মধ্য থেকে একটি সা' নিয়ে বাজারে গেলাম এবং তা মেপে তার পরিমাণ পাঁচ সমস্ত তিনভাগের এক রিতল পেলাম। এরপর আমি ইরাকে ফিরে আসি এবং ইরাকবাসীকে লক্ষ্য করে বললাম, আমি তোমাদের নিকট একটি নতুন তথ্য নিয়ে এসেছি। লোকেরা বললো, সে নতুন তথ্যটি কী? তিনি বললেন, মাদীনাতুর রাসূলে সা'-এর পরিমাণ হলো পাঁচ সমস্ত তিনভাগের এক রিতল। লোকেরা বললো, তাহলে তো তুমি জনপদের শায়খ অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরোধিতা করলে?! ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. বললেন, মাদীনায় আমি এমন বিষয় দেখতে পেলাম, যার বিরোধিতা

৪৯. তাকী উছমানী, *মাযহাব কি ও কেন?* (ঢাকা: মোহাম্মদী বুক হাউস, তা. বি.), পৃ.১৭৫-৬

করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমান অবধি এ সংক্রান্ত হানাফীগণের মত হলো- ইমাম আবূ ইউসূফের দৃষ্টিতে সা'-এর পরিমাণ হলো- পাঁচ সমস্ত তিনভাগের এক রিতল, আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম যুফার রহ. প্রমুখের মতে- আট রিতল।[৫০]

ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.-এর এ ঘটনা দুটিতে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. নিজের ইমামের মতের অন্ধ অনুকরণ করে বসে থাকেননি; বরং সাহীহ হাদীস ও দলীল পাওয়া মাত্রই নিজ ইমামের মত প্রত্যাখ্যান করে সাহীহ হাদীসের ওপরই 'আমাল করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং সাথে সাথে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইমামের মতের কারণে হাদীস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। ইমাম আবূ হানীফাহ রহ. নিজেও শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, আমার কোনো মত যদি কোনো সাহীহ হাদীসের পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমরা হাদীসকে গ্রহণ করে আমার মতকে উপেক্ষা করবে।

গ.৩. ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর দুটি মাযহাব রয়েছে। একটি হলোঃ 'কাদীম' (পুরাতন)। এটি তাঁর পুরাতন মাযহাব, যা তিনি বাগদাদে অবস্থানকালে পোষণ করতেন এবং এ মাযহাবের মতগুলো তিনি হিজরী ১৯৫ সালে তাঁর কিতাব 'আল-হুজ্জাত'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি এ মাযহাবের অধিকাংশ মত থেকে ফিরে আসেন এবং এগুলো দ্বারা ফাতওয়া দেওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁর এ মাযহাবের মধ্যে সাধারণত মালিকী মাযহাবের মতগুলোর ছাপই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর অপর মাযহাবটি হলো 'জাদীদ' (নতুন)। এটি তিনি মিসরে অবস্থানকালে তাঁর পুরাতন মাযহাবের বিপরীতে প্রবর্তন করেন এবং এ মাযহাবের মতগুলো তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-উম্ম'-এ লিপিবদ্ধ করেন। উত্তরকালে এটিই তাঁর মাযহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, যদি কোনো মাস'আলায় ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর দুটি অভিমত পাওয়া যায়, একটি পুরাতন ও অপরটি নতুন, তা হলে তাঁর নতুন অভিমতটিই গৃহীত হবে। তাঁর পুরাতন মতটি গ্রহণ করা যাবে না। এটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।[৫১] ইমাম শাফি'ঈ রহ. নিজেও বলেন, ليس في حلٍّ من رَوَى عَنِّي القَدِيمَ "আমার নিকট থেকে 'কাদীম' মত বর্ণনাকারীগণ স্বাধীন নন।"[৫২] অর্থাৎ তাঁদের জন্য এটা বর্ণনা করা বৈধ নয়।

---

৫০. 'আতিয়্যাহ, *শারহুল আরবাঈন*, পৃ. ৭

৫১. তবে ১৭টি মাস'আলা এর ব্যতিক্রম। এ মাস'আলাগুলোতে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর কাদীম মতানুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন।

৫২. যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত*, খ. ৪, পৃ. ৫৭৪

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর এ মাযহাব পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো, তিনি জীবনের শেষ অধ্যায়ে এমন অনেক হাদীস অবগত হন, যা তাঁর পক্ষে জীবনের প্রথম দিকে অর্জন করা সম্ভব হয়নি।[৫৩] তা ছাড়া তিনি আরব, মিসর ও বাগদাদের সার্বিক অবস্থার মধ্যেও বহু পার্থক্য দেখতে পান। বলাই বাহুল্য, ক্ষেত্রবিশেষে সময়, স্থান ও অবস্থাভেদে হুকমের মধ্যেও ভিন্নতা তৈরি হয়।[৫৪] ফলে তাঁর নিকট যে মতগুলো তাঁর পরবর্তীকালে অর্জিত হাদীসের পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং তাঁর যে ইজতিহাদগুলো অবস্থা ও সময়োযোগী মনে হয়নি, তিনি সে মত ও চিন্তাগুলো অবলীলায় ত্যাগ করেন এবং হাদীসের মর্ম, অবস্থা ও সময়ের দাবি অনুযায়ী নতুন মত গ্রহণ করেন।

ঘ. গবেষণাধর্মী বিষয়ে ভিন্নরূপ 'আমালকারীকে খারাপ মনে না করা

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে মতপার্থক্য করেছেন; কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁদের মতের ভিন্নরূপ 'আমালকারীকে খারাপ জানতেন না। সুফইয়ান আছ-ছাওরী [৯৭-১৬১ হি.] রহ. বলেন, إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه "মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে কাউকে তোমার মতের বিপরীত 'আমাল করতে দেখলে তাকে বাঁধা দিয়ো না।"[৫৫] তিনি আরো বলেন, ما اختلف فيه الفقهاء، فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به "ফাকীহদের মতবিরোধ রয়েছে- এমন ক্ষেত্রে কোনো ভাইকে আমি যে কোনো মত গ্রহণে বাঁধা দেই না।"[৫৬]

সুফইয়ান আছ-ছাওরী রহ.-এর উপর্যুক্ত দুটি মন্তব্য থেকে তাঁর এ কর্মনীতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, তিনি নিজে একজন উঁচু মাপের মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য

---

৫৩. যেমন মোজার ওপর মাসহের সময়সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো। ইমাম শাফি'ঈ রহ. ইরাকে থাকা কালে ইমাম মালিক রহ.-এর মতো মোজার ওপর মাসহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকার পক্ষে ফাতওয়া দেন। পরবর্তীতে তিনি মিসরে এসে এতদসংক্রান্ত হাদীসগুলো পাওয়ার পর তাঁর পুরাতন মত ত্যাগ করেন এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত সময় নির্ধারণ করে ফাতওয়া দেন। [ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *আল-ইস্তিযকার* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২১; নাবাবী, *শারহুল মুহাযযাব* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর), খ. ১, পৃ. ৫৪৫]

৫৪. যেমন ইমাম শাফি'ঈ রহ. মিসরে এসে দেখতে পেলেন যে, এখানকার চামড়া শিল্প অনেক উন্নত এবং এটি মিসরের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখে চলেছে, যা তিনি হিজাযে দেখতে পাননি। ফলে তিনি এতদসংক্রান্ত তাঁর পুরাতন মত ত্যাগ করে প্রক্রিয়াজাত চামড়া বিক্রির পক্ষে নতুন ফাতওয়া দেন। (মুরাগশালী, *ইখতিলাফুল ইজতিহাদ ওয়া তাগাইয়্যুরুহু ...,* পৃ. ৩৮৪)

৫৫. আবূ নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'আরবী, ১৪০৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩৬৮; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ২, পৃ. ৩৫৫

৫৬. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ২, পৃ. ৩৫৪

মুজতাহিদের মতকে না-হক মনে করতেন না। তদুপরি তাঁর 'ভাই' শব্দটি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এতে আমাদের জন্য শিক্ষা লাভের বহু উপকরণ নিহিত রয়েছে।

ইসলামী শারীআহের একটি সাধারণ মূলনীতি হলো, لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه "মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বাধা দেওয়া যাবে না। কেবল সর্বসম্মত বিষয়ে বাধা দেওয়া যাবে।"[৫৭] ইমাম নাবাবী রহ. বলেন:

> ... ثم العلماء انما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا انكار فيه لان على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب.
>
> "আলিমগণ কেবল এমন সব ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ করবেন, যেসব কাজ অন্যায় হওয়ার ব্যাপারে 'উলামা কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বাঁধা দান করা বৈধ নয়। কেননা প্রত্যেক মাযহাবের মুজতাহিদই সঠিক।"[৫৮]

ইমাম গাযালী [মৃ. ১১১১ খ্রি.] রহ. বলেন:

> الشرط الرابع أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر...
>
> "(অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রে) চতুর্থ শর্ত হলো কাজটি সর্বজন পরিচিত মন্দ কাজ হতে হবে এবং এর মন্দ হওয়াটা ইজতিহাদ নির্ভর হবে না। কাজেই যে কোনো কাজে মন্দ হওয়াটা ইজতিহাদ নির্ভর হলে তাতে বাঁধা দেওয়া যাবে না। যেমন কোনো হানাফী মতাবলম্বী ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে কোনো শাফি'ঈ মতাবলম্বীকে গুঁই সাপ, হায়েনা ও বিসমিল্লাহ ব্যতীত জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে বাঁধা দেবে। (কেননা এগুলো হানাফী মাযহাবে জায়িয না হলেও শাফি'ঈ মাযহাব মতে জায়িয।) অনুরূপভাবে শাফি'ঈ মতাবলম্বী ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে কোনো হানাফী মতাবলম্বীকে নেশা উদ্রেক করে না এরূপ নাবীয পান করার ব্যাপারে বাঁধা দেবে। (কেননা নাবীয শাফি'ঈ মাযহাবে জায়িয না হলেও হানাফী মাযহাব মতে জায়িয।) ..."[৫৯]

বিজ্ঞ ইমামগণের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, অন্যায় কাজের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীকে অবশ্যই এ কথা জানতে হবে, তিনি যে বিষয় থেকে লোকদেরকে বারণ করছেন, তা নিঃসন্দেহে ইমামগণের সর্বসম্মতভাবে হারাম বা

---

৫৭. সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযা'য়ির* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.), পৃ. ১৫৮ (কা'য়িদা নং: ৩৫)

৫৮. নাবাবী, *আল-মিনহাজু শারহু সাহীহি মুসলিম* (বৈরূত: দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল 'আরবী, ১৩৯২ হি.), খ. ২, পৃ. ২৩

৫৯. গাযালী, *ইহ্য়াউ 'উলূমুদ্দীন* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ), খ. ২, পৃ. ৩২৫

মাকরূহ। ইমামগণ যেসব বিষয়ে হালাল-হারাম কিংবা জায়িয-নাজায়িয হবার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন, সেসব বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কাউকে নিজের মাযহাবের পরিপন্থী কাজ করতে দেখলে তাকে বাঁধা প্রদান করা সমীচীন নয়। যেমন- ধরুন, আপনি মাসজিদে শাবাবীতে বসে দীনী ইলম চর্চা করছেন। এ সময় আপনি দেখতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি সালাতুল 'আসরের পরে মাসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়ছেন। আর আপনি মনে করেন যে, সালাতুল 'আসরের পর কোনো নামায নেই। এ অবস্থায় যদি আপনি লোকটিকে কার্যত বাঁধা দিতে চান, তাহলে আপনাকে জানতে হবে যে, এ বিষয়ে সকল ইমামের মত কী? যদি আপনি জানতে পারেন যে, ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর মতে, সালাতুল 'আসরের পর নামায পড়া জায়িয, তাহলে আপনার জন্য নামাযরত লোকটিকে বাঁধা প্রদান করা সমীচীন হবে না। কেননা, সে তো এ কথা বলতে পারে যে, কী কারণে আমি নামায পড়বো না? হয়তো তখন আপনি বলবেন যে, তিনজন ইমামের মতে- এ সময় কোনো নামায নেই। আপনার এ কথা শুনে লোকটি আপনাকে বলতে পারে যে, আমি তো শাফি'ঈ মতাবলম্বী। তাঁর মতে, সালাতুল 'আসরের পরেও নামায পড়া যায়। আর তোমাদের মাযহাবগুলো আমার মাযহাবের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। তখন হয়তো আপনি তাকে এতদসংক্রান্ত হাদীসটি বলবেন। কিন্তু সেও আপনাকে বলতে পারেন যে, এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীস রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي "যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন নামায পড়া ব্যতীত বসে না যায়।" এভাবে আপনি হয়তো এমন এক ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যাবেন, যা বাঞ্ছনীয় নয়।

৬. ইমামগণের একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও একে অপরের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন এবং যে কারণে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবও গড়ে ওঠেছে। এতদসত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। তাঁরা একে অপরকে সম্মান করতেন এবং প্রত্যেকেই অপরের যোগ্যতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতেন। কেউ কাউকে নিজের মত গ্রহণ করার জন্য চেষ্টাও চালাননি এবং একে অপরের জ্ঞান ও দীনদারীর ওপর কোনোরূপ অভিযোগও আরোপ করেননি। অধিকন্তু, প্রত্যেকেই একে অপরের সশ্রদ্ধ প্রশংসা করেছেন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তাঁদের এরূপ কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্তব্য ও ঘটনা তুলে ধরছি।

৬.১. ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তাঁর শিষ্যদের সাথে ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর মতপার্থক্যের কথা সর্বজন বিদিত। এ মতপার্থক্যের কারণে আলাদা দুটি মাযহাবের উদ্ভব হয়। এতদসত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্পর্ক কেমন মধুর ছিল নিম্নে উল্লেখিত ইমাম শাফি'ঈ রহ. কয়েকটি মন্তব্য থেকে তা পরিস্ফুট হবে। তিনি ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফাহ রহ.-এর শ্রেষ্ঠত্বের অকুণ্ঠ

স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة رحمه الله "কেউ ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চাইলে তাকে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শিষ্যত্ব বরণ করতেই হবে।"[৬০] তিনি আরো বলেন, الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. "লোকেরা ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কাছে শিষ্যস্বরূপ।"[৬১] তিনি আরো বলেন, ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة. يعني ما علمت. "ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর চাইতে বিজ্ঞ কোনো ফাকীহ আমি দেখতে পাইনি।"[৬২] তিনি আরো বলেন, كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه "আবূ হানীফা ছিলেন ফিকহ শাস্ত্রে তাওফীক প্রাপ্তদের অন্যতম।"[৬৩]

এমনকি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শিষ্যদের প্রতিও তিনি ছিলেন একান্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি বলেন:

> من أراد الفقه فليلزم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله والله ما صرت فقيها إلا باطلاعي في كتب أبي حنيفة لو لحقته قد لازمت مجلسه
>
> "কেউ ফিকহ অর্জন করতে চাইলে সে যেন ইমাম আবূ হানীফা রা.-এর শিষ্যদের সাহচর্য গ্রহণ করে। আল্লাহর কাসাম! আবূ হানীফা রহ. (অর্থাৎ তাঁর শিষ্যদের) গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেই আমি ফাকীহ হতে পেরেছি। যদি আমি তাঁর সাথে মিলিত হতে পারতাম, তাহলে আমি সর্বক্ষণ তাঁর মাজলিসে বসে থাকতাম।"[৬৪]

ঙ.২. ইমাম মালিক রহ. নিজে একজন বড় মুজতাহিদ। এতদসত্ত্বেও তিনি ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অসাধারণ যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته "আমি এমন এক অসাধারণ ব্যক্তি (আবূ হানীফা রহ.)কে দেখলাম, যাকে যদি তুমি বলো যে, (গাছের) এ স্তম্ভকে স্বর্ণরূপে প্রমাণিত করো, তাহলে তিনি দলীল-প্রমাণ দ্বারা (গাছের) এ স্তম্ভকে স্বর্ণরূপে প্রমাণিত করে ছাড়বেন।"[৬৫] ইমাম লাইছ ইবনু সা'দ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মাদীনায় ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে সাক্ষাত করি। এ সময় আমি তাঁকে বললাম, আমি তো আপনার কপালে ঘাম মাস্‌হ করার গন্ধ পাচ্ছি!

---

৬০. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), খ. ১৩, পৃ. ৩৪৬; 'আবদুল 'আযীয আল-বুখারী, কাশফুল আসরার (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩০

৬১. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৬

৬২. প্রাগুক্ত

৬৩. প্রাগুক্ত

৬৪. 'আবদুল 'আযীয আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ. ১, পৃ. ৩০

৬৫. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৮; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৯; ইবনু খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান* (বৈরূতঃ দারু ছাদির), খ. ৫, পৃ. ৪০৯

ইমাম মালিক বললেন, عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري " হে মিসরীয় 'আলিম, আবূ হানীফা রহ.-এর কারণে আমার গলদঘর্ম হয়ে গেছে। তিনি অবশ্যই একজন ফাকীহ।" লাইছ রহ. বলেন, পরে আমি আবূ হানীফাহ রহ.-এর সাথে সাক্ষাত করি এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আপনার ব্যাপারে ইমাম মালিকের মন্তব্য কতোই না উত্তম! তখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, ما رأيت أسرع منه بجواب صادق، وزهد تام "আমি ইমাম মালিক রহ.-এর চেয়ে দ্রুত সঠিক জবাব দিতে পারেন এবং পূর্ণ নির্মোহ এমন কাউকে দেখতে পাইনি।"[৬৬] লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, তিনজনই বড় বড় মুজতাহিদ এবং আলাদা তিনটি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা; এতদসত্ত্বেও তাঁরা যেভাবে একে অপরকে মূল্যায়ন করলেন, তাতে আমাদের জন্য শিক্ষা লাভের অনেক উপকরণ বিদ্যমান।

৬.৩. ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. দুজনেই দুটি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর একে অপরকে শ্রদ্ধা করতেন। একদিন ইমাম শাফি'ঈ রা. ইমাম আহমাদ রহ. কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

> إذا صح عندكم الحديث، فأخبرونا حتى نرجع إليه أنتم أعلم بالاخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح، فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا.
>
> "যেহেতু হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে আপনারা শ্রেষ্ঠ, সেহেতু আমার অজানা কোনো সাহীহ হাদীস আপনার সংগ্রহে থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। সে জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর কূফা, বাসরা বা শাম সফর করতেও আমি তৈরি আছি।"[৬৭]

অন্য মাযহাবের ইমামের সামনে একজন বরেণ্য ইমামের এমন অতুলনীয় বিনয় প্রকাশ নিঃসন্দেহে তাঁদের ইখলাস, আন্তরিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। অপরদিকে ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর প্রতি ইমাম আহমাদ রা.-এর সশ্রদ্ধ অনুভূতিও লক্ষ্য করার মতো। হাদীসে বর্ণিত আছে, إن الله يقيض في رأس كل مائة سنة من يعلم الناس دينهم "প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় আল্লাহ তা'আলা এমন এক ব্যক্তি পাঠান, যিনি মানুষকে দীন শিক্ষা দান করেন।" এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, فكان في المائة الأولى عمر بن عبد العزيز وفي المائة الثانية الشافعي "প্রথম শতাব্দীতে সেই মানুষটি ছিলেন 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয র.। আর দ্বিতীয় শতাব্দীতে হলেন ইমাম শাফি'ঈ রহ.। চল্লিশ বছর ধরে তাঁর জন্য আমি দু'আ ও ইস্তিগফার করছি।"[৬৮] তিনি আরো বলেন, ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي

---

৬৬. কাদী 'ইয়াদ, *তারতীবুল মাদারিক...*, (http://www.alwarraq.com), খ. ১, পৃ. ৩৬

৬৭. যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ. ১১, পৃ. ২১৩

৬৮. মুহাম্মাদ শামসুল হক আল-'আযীমাবাদী, *'আউনুল মা'বূদ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.), খ. ১১, পৃ. ২৬১

"আমি চল্লিশ বছর ধরে প্রত্যেক নামাযে তাঁর জন্য দু'আ করে আসছি।"[৬৯] একবার ইমাম আহমাদ রহ.-এর পুত্র আবদুল্লাহ রহ. তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কেন ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর কথা বেশি বেশি আলোচনা করেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন। তখন তিনি জবাব দেন, يا بني كان الشافعي كالعافية للناس وكالشمس للدنيا "প্রিয় পুত্র, ইমাম শাফি'ঈ হলেন মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির আরোগ্য এবং পৃথিবীর জন্য সূর্যতুল্য।"[৭০] তিনি আরো বলেন, ما رأيت أحدا أتبع للحديث من الشافعي "সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণেও তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"[৭১]

ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. "ফিকহ তালাবদ্ধ ছিল। ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর মাধ্যমে আল্লাহ সে তালা খুলেছেন।"[৭২] তিনি আরো বলেন, ما أحد يعلم في الفقه كان أحرى أن يصيب السنة لا يخطئ إلا الشافعي "ফিকহের আলোচনায় তাঁর চেয়ে কম ভুল আর কারো নেই।"[৭৩]

৬.৪. ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক রহ. দুজনেই বড় মুজতাহিদ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের দুজনের পরস্পরের মূল্যায়ন দেখুন, ইমাম শাফি'ঈ রহ. বলেন, عنه أخذنا العلم وإنما أنا غلام من غلمان مالك. "আমি তাঁর খিদমতে থেকে ইলম হাসিল করেছি। আমি তাঁর একজন গোলাম মাত্র।"[৭৪] মুহাম্মাদ ইবনুল হাকাম রহ. বলেন, ইমাম শাফি'ঈ রহ. ইমাম মালিক রহ.-এর কোনো উদ্ধৃতি এভাবে দিতেন যে, هذا قول الأستاذ. "এটা উস্তাদের (অর্থাৎ ইমাম মালিকের) বক্তব্য।"[৭৫] ইমাম শাফি'ঈ রহ. বলতেন, ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك "জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক রহ.-এর সংকলিত কিতাবের চেয়ে বিশুদ্ধ কোনো কিতাব পৃথিবীতে নেই।"[৭৬] তিনি আরো বলেন, إذا ذكر العلماء فمالك النجم "'আলিমগণের আলোচনা হলে সকলের মাঝে ইমাম মালিক রহ.-এর অবস্থান হবে নক্ষত্রতুল্য।"[৭৭] তিনি আরো

---

৬৯. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক* (বৈরূত: দারুল ফিকর), খ. ৫১, পৃ. ৩৪৬
৭০. প্রাগুক্ত, খ. ৫১, পৃ. ৩৪৯
৭১. আবু নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া,* খ. ৯, পৃ. ১০৭
৭২. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দামিশক,* খ. ৫১, পৃ. ৩৪৫; নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত,* পৃ. ৮৬
৭৩. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দামিশক,* খ. ৫১, পৃ. ৩৫০
৭৪. কাদী 'ইয়াদ, *তারতীবুল মাদারিক,* খ. ১, পৃ. ৩৬, ১৩৮
৭৫. *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ৩৬, ১৩৮
৭৬. ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল,* খ.১, পৃ. ১২; যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* খ. ১, পৃ. ১৫৪
৭৭. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* খ. ১, পৃ. ১৫৪ কোথাও কোথাও ইমাম শাফি'ঈ রাহ.-এর বক্তব্যটি এভাবে এসেছে,.إذا جاء الأثر، فمالك النجم -"হাদীসের আলোচনা আসলে সকলের

বলেন, لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز "ইমাম মালিক ও সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ রহ. না হলে হিজাযের 'ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেতো।"[৭৮] অপরদিকে ইমাম মালিক রহ. ইমাম শাফি'ঈ রহ. সম্পর্কে বলেন, "শাফি'ঈ রহ.-এর চেয়ে মেধাবী কোনো কুরাইশী তরুণ আমার কাছে আসেনি।"[৭৯]

চ. দৃঢ় জ্ঞান লাভ করা ছাড়া মতপার্থক্য করা থেকে বিরত থাকা

আমরা আমাদের সালাফে সালিহীন ও মুজতাহিদ ইমামগণকে দেখতে পাই যে, তাঁরা যে কোনো বিষয়ে ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতেন না। কারো কোনো প্রশ্নের জবাব দৃঢ়ভাবে জানা না থাকলে তিনি সরাসরি 'জানি না' বলে উত্তর দিতেন, আন্দাজ-অনুমানের ওপর ভিত্তি করে খামাখা ইখতিলাফে জড়িয়ে পড়তেন না। বর্ণিত আছে যে, একবার কিছু লোক 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রা.-এর জনৈক পুত্র থেকে এমন একটি মাস'আলা সম্পর্কে জানতে চাইলো, যে ব্যাপারে তাঁর যথাযথ জ্ঞান ছিল না। এ সময় ইয়াহয়া ইবনু সা'ঈদ রা. তাঁকে বললেন,

وَاللّٰهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَيِ الْهُدَى - يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ - تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ.

"আপনি হলেন হিদায়াতের দু জন ইমাম অর্থাৎ সাইয়িদুনা 'উমার ও তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহর সন্তান। আপনার নিকট একটি মাস'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অথচ আপনার নিকট এ সম্পর্কে জ্ঞান নেই। আল্লাহর কাসাম! তা কেমন করে হতে পারে? এটা তো রীতিমতো আশ্চর্যের ব্যাপার।"

তিনি জবাব দিলেন:

أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللّٰهِ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّٰهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ.

"আল্লাহর কসম! আল্লাহর নিকট এবং তাঁর জ্ঞানী বান্দাহদের নিকট এর চেয়েও বড় জঘন্য ব্যাপার হলো, আমি যথার্থ 'ইলম ছাড়া কোনো মত প্রকাশ করবো কিংবা অবিশ্বস্ত লোকদের নিকট শুনে কিছু বর্ণনা করবো।"[৮০]

হায়ছাম ইবনু জামীল রহ. বলেন, আমি দেখেছি যে, একবার ইমাম মালিক রহ. থেকে চল্লিশটি মাস'আলা জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি মাত্র চারটি বিষয়ের জবাব দেন,

---

মধ্যে ইমাম মালিকের অবস্থান হলো নক্ষত্রের মতো।" (নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত,* পৃ. ৬০০)

৭৮. ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী, *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল,* খ. ১, পৃ. ১২; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ,* খ. ৯, পৃ. ১৭৯; যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* খ. ১, পৃ. ১৫৪

৭৯. ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, *মানাকিবুশ শাফি'ঈ,* পৃ. ৫৮

৮০. মুসলিম, *আস-সাহীহ, আল-মুকাদ্দামাহ,* হা.নং: ৩৭

বাকী ছত্রিশটি বিষয় সম্পর্কে বলেন, لا أدري "আমি জানি না।"[৮১] ইমাম মালিক রহ. সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, একবার তাঁকে পঞ্চাশটি মাস'আলা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি একটি মাস'আলারও জবাব দেননি; বরং বললেন:

> من أحاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب
>
> "যে ব্যক্তি কোনো মাস'আলার উত্তর দিতে চায়, সে যেন প্রথমে নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের সামনে পেশ করে এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের পথ বের করে নেয়, অতঃপর উত্তর প্রদান করে।"[৮২]

ইমাম শাফি'ঈ রহ.কে একটি মাস'আলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার উত্তর দেননি। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب "আমি যখন জানবো, চুপ থাকার মধ্যে, না-কি উত্তর দেওয়ার মধ্যে ছাওয়াব হয়, তখনই আমি উত্তর দেবো।"[৮৩] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. সম্পর্কেও জানা যায় যে, তিনি অধিকাংশ সময় প্রশ্নের উত্তরে 'আমি জানি না' বলতেন। ইমাম আল-আছরাম [মৃ. ২৭৩ হি.] রহ. বলেন, سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري "আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.কে অধিকাংশ সময় মাস'আলা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে 'আমি জানি না' বলতে শোনেছি।"[৮৪]

ছ. গুরু ও অভিজ্ঞজনের ওপর ফাতওয়ার ভার ন্যস্ত করা

ইসলামের একটি মহান শিক্ষা হলো, জ্ঞানে, গুণে ও বয়সে বড়জনকে শ্রদ্ধা করা। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا "যে আমাদের ছোটজনকে দয়া করবে না এবং বড়জনকে সম্মান করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৮৫] কাজেই বড়জনদের সামনে নিজের পাণ্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চেষ্টা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে খামাখা মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। কখনো কোথাও নিজের অভিমত পেশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা

---

৮১. নাবাবী, *আদাবুল ফাতওয়া* (দিমাশক: দারুল ফিকর, ১৪০৮ হি.), পৃ. ১৬; নু'মান আল-আলূসী, *জালাউল 'আইনাইন*, খ. ১, পৃ. ১৮৩; ইবনু আবিল ওয়াফা, *আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাতু..*, খ. ২, পৃ. ৪৫৮

৮২. নাবাবী, *আদাবুল ফাতওয়া*, পৃ. ১৬

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৮৪. প্রাগুক্ত

৮৫. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল বিররি..), হা. নং: ১৯১৯ কোনো কোনো সূত্রে وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا এর পরিবর্তে وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا এসেছে। এর অর্থ হলো- যে আমাদের বড়জনের অধিকার জানলো না...। (আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, [কিতাবুল আদাব], হা.নং: ৪৯৪৫)

হয়েছে যে, আমাদের সালাফে সালিহীন ও মুজতাহিদ ইমামগণ যে কোনো বিষয়ে ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতেন না। তাঁরা নিজেরা পারত পক্ষে ফাতওয়া দান করা থেকে বিরত থাকতেন এবং আন্তরিকভাবে কামনা করতেন যে, তাঁদের পক্ষ থেকে অপর কেউ ফাতওয়া দান করুক। আবার অনেকেই নিজে মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও গুরু ও অভিজ্ঞ জনের নিকট ফাতওয়ার ভার ন্যস্ত করতে চাইতেন। ইমাম শা'বী, আল-হাসান আল-বাসরী ও আবূ হাসীন আল-আসাদী রহ. প্রমুখ তাবি'ঈগণ বলেন:

إنَّ أَحَدَكُمْ لَيُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ.

"তোমাদের যে কেউ তো যে কোনো মাস'আলায় ফাতওয়া দিতে চাও। অথচ সাইয়্যিদুনা 'উমার রা.-এর নিকট যখন কোনো মাস'আলা উত্থাপিত হতো, তখন তিনি নিজে উত্তর না দিয়ে এর জন্য বাদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণকে একত্রিত করতেন, যেন তাঁরাই মাস'আলাটির উত্তর প্রদান করেন।"[৮৬]

'আবদুর রাহমান ইবনু আবী লায়লা রহ. বলেন:

أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه قد كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.

"আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর একশ বিশ জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছি; কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ হাদীস বর্ণনা করতে চাইতেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই কামনা করতেন যে, তাঁর অপর ভাইদের হাদীস বর্ণনা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে তাঁদের মধ্যে কেউ ফাতওয়া দিতে চাইতেন না। তবে তাঁরা প্রত্যেকেই কামনা করতেন যে, তাঁর অপর ভাইদের ফাতওয়া তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে।"[৮৭]

মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-মুরাদী রহ. থেকে বর্ণিত, মাদীনার বিশিষ্ট শায়খ আবূ ইসহাক রহ. বলেন:

"আমি ঐ যুগে লোকদের দেখতাম যে, যখন তাদের নিকট কেউ কোনো প্রশ্ন নিয়ে আসতো, তখন তারা তাকে এক মাজলিস থেকে অন্য মাজলিসে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে তাকে মাদীনার বিশিষ্ট ফাকীহ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রা.-এর নিকট পাঠানো হতো। এর কারণ ছিল, তারা নিজেরা ফাতওয়া দিতে পছন্দ করতেন না এবং তাঁরা সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব রা.কে এ জন্য الجريء (দুঃসাহসী) নামে অভিহিত করতেন।"[৮৮]

---

৮৬. নাবাবী, *আদাবুল ফাতওয়া*, পৃ. ১৬; ইবনুস সালাহ, *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুস্তাফতী*, পৃ. ১০

৮৭. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা* (বৈরূতঃ দারু ছাদির), খ. ৬, পৃ. ১১০; ইবনুল মুবারাক, *আয-যুহদ*, হা.নং: ৫৮; বায়হাকী, *আল-মাদখাল..*, হা.নং: ৬৫৪, ৬৫৫; ইবনু 'আবদিল বাররে, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম*, খ. ২, পৃ. ৩১৫ (হা. নং ১১৩৭)

৮৮. ইবনু 'আবদিল বাররে, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম*, খ. ২, পৃ. ৩১৭ (হা.নং: ১১৪৩)

সুফইয়ান আছ-ছাওরী রহ. নিজে একজন মুজতাহিদ ও ইমাম ছিলেন এবং ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সাথে তাঁর যথেষ্ট মতপার্থক্যও ছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর মতামতের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি তাঁকে যুগের শ্রেষ্ঠ ফাকীহরূপে জানতেন।[৮৯] বর্ণিত আছে যে, একসাথে হজ্জ পালন কালে সুফইয়ান আছ-ছাওরী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পেছনে চলতেন। আর কোনো মাস'আলা পেশ হলে তিনি নীরব থাকতে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ই জবাব দিতেন।

জ. শরয়ী দলীলনির্ভর প্রচলিত রীতির প্রতি নজর রাখা

সালাফে সালিহীন ও মুজতাহিদ ইমামগণ ফাতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য দেশে শরয়ী দলীলনির্ভর প্রচলিত রীতির প্রতি নজর রাখতে চেষ্টা করতেন। কোথাও কোনো মুজতাহিদ ইমামের মতানুযায়ী কোনো রীতি প্রচলন লাভ করে থাকলে তাঁরা ঐ এলাকায় এরূপ কোনো রীতির পরিপন্থী ফাতওয়া প্রচার করে এবং সে আলোকে 'আমালের জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করে উম্মাতের মধ্যে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে কিংবা তাদেরকে বিভক্ত করতে চাইতেন না। হুমাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালীফা 'উমার ইবনু 'আবদিল আযীয রা.-এর নিকট ফাকীহদের মতপার্থক্য দূর করে সকলকে অভিন্ন মতে একত্রিত করতে আরয করলাম, لو جمعت الناس على شيء! "যদি আপনি সকল লোককেই অভিন্ন মতের ওপর একত্রিত করতেন!" তিনি জবাব দেন, ما يسرني انهم لم يختلفوا. "তাঁদের অর্থাৎ সাহাবীগণের মতভিন্নতা না থাকাটা আমার কাছে আনন্দের বিষয় নয়।" এরপর তিনি বিভিন্ন দেশে এ মর্মে নির্দেশ লিখে পাঠান, ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم. "প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই যেন নিজ নিজ দেশের ফাকীহগণের সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে ফায়সালা পেশ করে।"[৯০] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, খলীফা হারূনুর রাশীদ যখন উম্মাতের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে সকলকে মুওয়াত্তার ওপর একমত করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি এরূপ কাজ করতে বাঁধা দেন এবং বলেন:

> "রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন তা-ই বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু, প্রত্যেকে দেশের 'আমাল সে-ই অবস্থার ওপরই স্থিতিশীলতা লাভ করেছে, যা রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে তাদের কাছে পৌঁছেছে। কাজেই আপনি লোকদেরকে তাদের স্ব স্ব অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন না।"[৯১]

---

৮৯. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৪

৯০. দারিমী, *আস-সুনান*, মুকাদ্দামাহ, পরিচ্ছেদ: ইখতিলাফুল ফুকাহা', হা. নং: ৬২৮

৯১. 'আতিয়্যাহ, *শারহুল আরবাঈন*, পৃ. ৭

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, আমাদের পূর্বসূরী ইমামগণ দীনের গবেষণাধর্মী নানা অপ্রধান বিষয়ে ইজতিহাদের নিয়ম অনুসরণ করে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। বলাই বাহুল্য যে, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের এ ইজতিহাদ বিভিন্ন ফলাফল নিয়ে এসেছে সত্যি; কিন্তু তাঁদের সে বিভিন্নতায় কোনো প্রকারের জিদ্, প্রগল্ভতাও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। তাঁরা যথাসাধ্য মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন। ক্ষেত্রবিশেষে যে মতপার্থক্যগুলো হয়েছে তার পেছনে প্রধান কারণ ছিল দলীলের প্রচ্ছন্নতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা কিংবা দুর্বলতা। তদুপরি ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের মধ্যে যে মতপার্থক্য সংঘটিত হয় তা তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধে সামান্যতমও ব্যত্যয় ঘটাতে পারেনি। তাঁদের ইখলাস ও উদারতার অবস্থা এতোই পরিচ্ছন্ন ছিল যে, যখনই তাঁরা কোনো বিশুদ্ধ দলীল পেতেন কিংবা অন্যের যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হতেন, তখন তাঁরা কোনোরূপ কূটকচালের আশ্রয় নেয়া ব্যতীত সাথে সাথেই প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করে নিতেন। এমনকি তাঁরা শিক্ষক হয়েও ছাত্রদের বিশুদ্ধ যুক্তি ও বাস্তবসম্মত মতামত গ্রহণ করে নিতেও কোনো সময়ই কোনোরূপ কুণ্ঠিত হননি। উল্লেখ্য যে, তাঁদের এরূপ ইজতিহাদভিত্তিক উদারনৈতিক মতপার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে উম্মাতের জন্য বহু কল্যাণও বয়ে এনেছে। যেমন-

ক. যুগ ও পরিস্থিতির চাহিদা পূরণার্থে বিশেষ প্রয়োজনে নিজের মাযহাবের পরিবর্তে অন্য মাযহাব অনুসরণের পথ উন্মুক্ত রয়েছে। বলাই বাহুল্য, মাযহাবের বিভিন্নতা না থাকলে এ সুযোগ লাভ করা সম্ভব হতো না। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে ইমামগণ মতভিন্নতা পোষণ করলে পরবর্তীদের জন্য (বিশেষ প্রয়োজনে) যে কোনো একটি মত অনুসরণ করার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে কোনো বিষয়ে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করলে তার বাইরে যাওয়ার ইখতিয়ার কারো থাকতো না।[৯২] তাছাড়া ইমামগণের মতভিন্নতার কারণে ক্ষেত্রবিশেষে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সুযোগও তৈরি হয়।[৯৩] এসব কারণে অনেক 'আলিমই ইমামগণের ইখতিলাফকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ

৯২. যেমন হানাফী মাযহাবে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহের জন্য ৯০ বছর অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। এর ফলে বহু মুসলিম নারীর জীবনে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। পরবর্তীকালে এ সংকটাবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য হানাফী ইমামগণ নিজেরাই এ মত থেকে ফিরে আসেন এবং তাঁদের কেউ কেউ মালিকী মাযহাব অনুসারে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহের জন্য চার বছর অপেক্ষা করতে বলেন। আবার তাঁদের অনেকেই বিষয়টি আদালতের রায়ের ওপর ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। (ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রা'য়িক*, খ. ৫, পৃ. ১৭৮; যায়লা'ঈ, *তাবয়ীনুল হাকা'য়িক*, খ. ৩, পৃ. ৩১১)

৯৩. যেমন- মদখোর ও অন্যান্য কাবীরা গুনাহকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু দাবা খেলা হানাফী মাযহাবে কাবীরা গুনাহ হলেও শাফি'ঈ ও মালিকী মাযহাব মতে তা নয়। ফলে দাবা খেলায় জড়িতদের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনা করা হয়।

থেকে উম্মাতের জন্য একটি বিরাট রাহমাত ও প্রশস্ততার উপলক্ষ মনে করেন।[৯৪] ইবনু আবী ইয়া'লা [মৃ. ৫২৬ হি.] রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর শিষ্য বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ ইসহাক ইবনু বাহলূল আল-আম্বারী [১৬৪-২৫২ হি.] রহ. তাঁর একটি কিতাবের নাম রাখেন 'كتاب الاختلاف' (মতানৈক্যের গ্রন্থ)। ইমাম আহমাদ রহ. এ কিতাবটি দেখে তাঁকে বললেন, "তুমি গ্রন্থটির নাম রাখো 'كتاب السعة' (প্রশস্ততার গ্রন্থ); 'কিতাবুল ইখতিলাফ' নাম রেখো না।"[৯৫] মূসা আল-জুহানী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাইয়িদুল কুররা' তালহা ইবনু মুসাররাফ [মৃ. ১১২ হি.] রহ.-এর নিকট যখন (ইমামগণের) কোনো মতপার্থক্যের কথা আলোচনা করা হতো, তখন বলতেন, لا تقولوا: الاختلاف، ولكن قولوا: السعة- "তোমরা একে 'মতপার্থক্য' বলো না; বরং তোমরা একে 'প্রশস্ততা' বলো।"[৯৬]

খ. ইমামগণের মতভিন্নতার কারণে লোকদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে 'আমাল তরকের কারণে ভয় ও শঙ্কা তৈরি হয়। অপরদিকে তারা ক্ষেত্রবিশেষে চূড়ান্ত হতাশা থেকেও নিস্কৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে ইমামগণ কোনো কোনো বিষয়ে একমত হলে লোকেরা হয়তো চূড়ান্ত হতাশা কিংবা ঔদাসিন্যের শিকার হয়ে পড়তো।[৯৭]

গ. ইমামগণের মতভিন্নতার কারণে ফিকহ শাস্ত্র প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং ক্রমশ তা বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে। এর ফলে বর্তমানে শরীআহ বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে বহু আধুনিক বিষয়ে স্থান, সময় ও পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী শরয়ী দলীলনির্ভর বাস্তব ও যুক্তিসম্মত রায় প্রদান করা সম্ভব হয়ে ওঠেছে। এতে উত্তরোত্তর সর্বমহলে ইসলামী ফিকহের যৌক্তিকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও সর্বজনীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রফেসর মুস্তাফা আয-যারকা' রহ. বলেন:

---

৯৪. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *শারহুল 'উমদাহ,* খ. ৪, পৃ. ৫৬৯; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ. ১, পৃ. ১৭০

৯৫. ইবনু আবী ই'য়ালা, *তাবাকাতুল হানাবিলাহ,* খ. ১, পৃ. ১১০; ইবনু তাইমিয়্যাহ, *শারহুল 'উমদাহ,* খ. ৪, পৃ. ৫৬৭; ইবনু মুফলিহ, *আল-মাকসিদ আল-আরশাদ..,* খ. ১, পৃ. ২৪৮

৯৬. আবু নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া,* খ. ৫, পৃ. ১৯

৯৭. যেমন- ইমামগণের মধ্যে কারো কারো মতে, ইচ্ছাকৃত নামায তরককারী কাফির। পক্ষান্তরে তাঁদের অনেকেই ফাতওয়া দিয়েছেন যে, ইচ্ছাকৃত নামায তরককারী যদি নামাযের ফারযিয়্যাত অস্বীকার না করে, তা হলে শুধু নামায তরক করার কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না; সে ফাসিক হবে। এ মতভিন্নতার কারণে প্রথমোক্ত ইমামগণের অনুসারীদের মনে যেমন কিঞ্চিত আশার সঞ্চার হয় (এবং এ কারণে তাঁরা বে-নামাযীকে কাফির বলা সত্ত্বেও তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো অথবা মুসলিম কবরস্থানে তাকে দাফন না করার কথা স্পষ্টভাবে বলেননি), তেমনি অপর ইমামগণের অনুসারীদের মনে শঙ্কা ও সতর্কতা দেখা দেয়। কেননা বে-নামাযী যখন জানবে যে, কোনো কোনো ইমামের ফাতওয়া মতে সে কাফির বলে গণ্য, তখন স্বভাবতই তার অন্তর ভয়ে কেঁপে ওঠবে এবং তাওবার মাধ্যমে নামাযের প্রতি যত্নবান হবে।

قد يظن بعض المتوهمين ممن لا علم عندهم ولا بصيرة أن اختلاف الاجتهادات في الفقه الإسلامي نقيصة، ويتمنون لو لم يكن إلا مذهب واحد، ... وأما الاختلاف الفقهي في الأحكام العملية المدنية فهو من المفاخر والذخائر؛ لأنه ثروة تشريعية كلمّا اتسعت كانت أروع وأنفع وأنجع .

"কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্বাচিন লোক ধারণা করে যে, ইসলামী ফিকহে ইজতিহাদী মতপার্থক্য একটি ত্রুটি। তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে, মাযহাব যদি কেবল একটিই হতো! ... বস্তুতপক্ষে ব্যবহারিক গণবিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ফিকহী ইখতিলাফ একটি গর্ব ও মূল্যবান সম্ভার বিশেষ। কেননা তা হলো আইনী সম্পদ, যা যতোই বৃদ্ধি পাবে, ততোই তার সৌন্দর্য, উপকারিতা ও কার্যকারিতা বাড়তে থাকবে।"[৯৮]

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, আমাদের পূর্বসূরী ইমামগণ দীনের নানা ব্যবহারিক বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন সত্যি; কিন্তু তাঁদের সে বিভিন্নতায় কোনো প্রকারের জিদ্‌ ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের মধ্যে যে মতপার্থক্য হয়েছে তার পেছনে প্রধান কারণ ছিল দলীলের প্রচ্ছন্নতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা কিংবা দুর্বলতা। তদুপরি তাঁদের এ মতপার্থক্য তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধে সামান্যতমও ব্যত্যয় ঘটাতে পারেনি। তাঁদের ইখলাস ও উদারতার অবস্থা এতোই পরিচ্ছন্ন ছিল যে, যখনই তাঁরা কোনো বিশুদ্ধ দলীল পেতেন কিংবা অন্যের যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হতেন, তখন তাঁরা কোনোরূপ কূটকচালের আশ্রয় নেয়া ব্যতীত সাথে সাথেই প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করে নিতেন। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, উত্তরকালে মুকাল্লিদরা ক্রমে তাঁদের মুজতাহিদ ইমামগণের সেই উদারনৈতিকতা ও পরমত সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অবস্থা এতোই নাজুক যে, ইখতিলাফ করার ক্ষেত্রে তারা ন্যূনতম শিষ্টাচার রক্ষার কোনো গরজ অনুভব করছেন না। এক মাযহাবের অনুসারীরা অন্য মাযহাবের অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত করে। প্রত্যেকে নিজের মাযহাবকে একমাত্র সঠিক এবং অন্যের মাযহাবকে ভ্রান্তরূপে চিহ্নিত করতে যাবতীয় প্রয়াস নিয়োগ করে। বলতে গেলে ইখতিলাফের ক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই একান্ত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, নিজের ও নিজের মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ এবং নিজের ও নিজের দলের স্বার্থ চরিতার্থ করা। আত্মপ্রীতি, পার্থিব মোহ, প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ে অক্ষমতাও এর প্রধান প্রধান কারণ। এ জাতীয় মতবিরোধ একদিকে তাদের পরস্পরের মধ্যে চরম হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করছে, অপরদিকে তারা দীনকে টুকরো টুকরো করছে এবং উম্মাতকে নানা দলে-উপদলে বিভক্ত করছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন! আমীন!!

---

৯৮. মুস্তাফা আয-যারকা', *আল-মাদখালুল ফিকহী*, খ. ১, পৃ. ২৬৯

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন : ২০১৬

ইসলামী ব্যাংকসমূহে চর্চিত 'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা': একটি শরয়ী বিশ্লেষণ

প্রফেসর ড. আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম*

An Investment Method of '*Murābahatu Lil Āmiri Bish-shirā*' practiced by Islamic Banks: a *Sharī'ah* based analysis

Abstract

Murābahatu Lil Āmiri Bish-shirā (مُرَابَحَة لِلْآمِر بِالشِّرَاء/ Murābaha in purchase order) is one of the investment methods exercised by Islamic Banks and financial organizations in the modern days. In recent days this method of investment, established based on traditional Murābaha, is most commonly exercised in many countries including Bangladesh. Present article is aimed to discuss process of transection through this investment method, opinion of Islamic scholars on legality of this kind of investment in the light of Islam, to remove doubt and confusion about this method and to present a guideline for exercising the method by Islamic banks as per the instruction of Sharī'ah. The article is prepared mostly following descriptive method together with applied method of presentation. The article tries to prove that investment through this kind of method, i.e. 'Murābahatu Lil Āmiri Bish-shirā' and dividend through this investment can be approved by Sharī'ah and be Halāl if it is exercised as per the instruction of Sharī'ah.

***Keywords**: Murābaha; Islamic Banking; sale on credit; Murābaha in purchase order.*

সারসংক্ষেপ

'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' (Murabaha in purchase order) আধুনিক যুগে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহে অনুসৃত অন্যতম বিনিয়োগ পদ্ধতি। সনাতন

* অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুরাবাহার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত এ বিনিয়োগ পদ্ধতি বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে সর্বাধিক অনুশীলিত। এ লেনদেনের প্রক্রিয়া, এর বৈধতা সম্পর্কে আলিমগণের মতামত, এ সম্পর্কিত সন্দেহ সংশয় নিরসন এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহে এর শরীআহসম্মত অনুশীলনের দিক নির্দেশনা উপস্থাপন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত বর্ণনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করার পাশাপাশি ক্ষেত্র বিশেষে প্রায়োগিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়, মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা যথাযথ শরীআহ পরিপালন করে অনুশীলন করা হলে তা হালাল ও এর থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশও হালাল। তবে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহকে খুব সতর্কতার সাথে এ পদ্ধতির অনুশীলন করা অপরিহার্য।

মূলশব্দ: মুরাবাহা, ইসলামী ব্যাংকিং, বাকিতে বিক্রয়, মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা।

ভূমিকা

বর্তমানে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহ শরী'আহভিত্তিক বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুশীলন করে। তন্মধ্যে 'বায়'উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা' অন্যতম অনুসৃত পদ্ধতি। বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগকৃত অর্থের সিংহভাগ এ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। এটি তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় অনেক প্রতিষ্ঠানে মাত্র এই একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেই বিনিয়োগ দেয়া হয়। সনাতন মুরাবাহা পদ্ধতি শরী'আহসম্মত হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ একমত হলেও 'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে শরীআহ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংকসমূহে কর্মরত দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণও এ বিনিয়োগ পদ্ধতির অনুশীলনে কখনো কখনো ভুল করে থাকেন, যা মূলত এ পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অত্র প্রবন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়টির পর্যালোচনা ও যথাযথ শরীআহ পালন করে এর বিশুদ্ধ অনুশীলনের পথ নির্দেশনা প্রদানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

'মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা'

বায়'উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা-এর অর্থ হচ্ছে, পণ্য ক্রয় করে দেয়ার আবেদনকারীর নিকট লাভে পণ্য বিক্রয় করা। এটি সুদবিহীন ব্যাংকিং ও অর্থায়নের জগতে অনুশীলিত একটি আধুনিক পরিভাষা। এ পরিভাষাটি সর্বপ্রথম সামী হাসান আহমদ হামূদ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধীনে উপস্থাপিত তার পিএইচডি থিসিসে ব্যবহার করেন।[১] ফলে এ পদ্ধতির ব্যাপারে পূর্বসূরী আলিমগণের

---

১. তার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية যা পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য: সামী হাসান হামুদ, *তাতভীরুল আ'মাল আল-মাসরাফিয়্যাহ বিমা ইয়াত্তাফিকু ওয়াশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ* (আম্মান: মাতবাআতুশ শারক ওয়া মাকতাবাতুহা, ২য় সংস্করণ, ১৪০২হি.)

কোন মন্তব্য পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক অনেক আলিম এর সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। যেমন আহমদ সালেম মুলহিম বলেন:

> طلب شراء للحصول على مبيع موصوف، مقدم من عميل إلى مصرف، يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين الأول بالشراء والثاني بالبيع، بثمن وربح يتفق عليهما مسبقا.

> গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংক বরাবর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পণ্য ক্রয় করে দেয়ার আবেদন, যা ব্যাংকের মঞ্জুরী এবং উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত মূল্য ও লাভের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষ পণ্য ক্রয়ের এবং দ্বিতীয় পক্ষ বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।[২]

পদ্ধতিটির স্বরূপ

এ পদ্ধতির অনুশীলন হয় এভাবে যে, একজন গ্রাহক ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এসে কোন সরবরাহকারীর নিকট হতে নির্ধারিত পণ্য ক্রয় করে দেয়ার জন্য আবেদন করবে। সরবরাহকারীর নিকট হতে উক্ত পণ্য ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ দ্বারা ক্রয় করবে। পরবর্তীতে গ্রাহক ও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে সব বৈধ শর্তে সম্মত হয়েছেন সেসব শর্তে নির্ধারিত লাভসহ তার (গ্রাহকের) নিকট বাকি মূল্য কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ধরে নিয়ে পণ্যটি বিক্রয় করা হবে ও পণ্যটি তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে। মূলত এই ক্রয় বিক্রয় তিনটি স্তরে সমাপ্ত হয় :

ক. অনুরোধ বা আবেদন: গ্রাহকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অুনরোধ বা আবেদন করা হয়দ

খ. চুক্তি সম্পাদন: এই চুক্তি দুটি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়

১. প্রথম পক্ষ অর্থাৎ গ্রাহক উক্ত পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার করে।

২. দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান উক্ত পণ্য গ্রাহককে ক্রয় করে দেয়ার অঙ্গীকার করে।

গ. ক্রয়-বিক্রয়: ভিন্ন ভিন্ন চুক্তিতে দু'টি ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে এ ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হবে।

প্রথম ক্রয় বিক্রয়

এটি সম্পাদিত হবে পণ্য সরবরাহকারী কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির মধ্যে। এখানে গ্রাহকের কোন ভূমিকা থাকবে না, তবে প্রতিষ্ঠান উক্ত গ্রাহককে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করলে সেটি ভিন্ন কথা। এ ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য স্বয়ং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরবরাহকারীকে প্রদান করবে; কোনভাবেই তা গ্রাহককে প্রদান করা যাবে না।

---

২. আহমাদ সালেম মুলহিম, *বাঈ' আল-মুরাবাহা ওয়া তাতবীকাতুহ ফীল মাসারিফিল ইসলামিয়্যাহ* (আম্মান: দারুছ ছাকাফাহ, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৭৫

দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয়

সরবরাহকারীর নিকট হতে ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান পণ্য বুঝে পেয়ে দখলে আসলে তা বাকিতে এবং কিস্তির ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে দিবে।

উল্লেখ্য, প্রথম ক্রয় বিক্রয়ে গ্রাহককে ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হলে তিনি সরবরাহকারীর নিকট হতে উক্ত পণ্য ক্রয় করে তা ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়ে দিবেন। ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান উক্ত পণ্য নিজের দখলে নিয়ে তারপর তা দ্বিতীয়বারে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করবে।

বায়'উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা'র শর্তাবলি

এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় শরীআহসম্মত হওয়ার শর্তাবলি হলো:

১. উভয় পক্ষই আসল মূল্য ও লভ্যাংশ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। যদি আসল মূল্যের সাথে অন্য কোন খরচাদি যুক্ত হয়ে থাকে তাও গ্রাহককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া;

২. ব্যাংকের প্রতিনিধি সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য বুঝে নেয়ার পর পণ্যে কোন ত্রুটি দেখা গেলে তাও গ্রাহককে জানিয়ে দেয়া;

৩. কতদিনে কত কিস্তিতে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে তা স্পষ্ট হওয়া;

৪. বিক্রেতা যদি পণ্যের কোন ক্ষতি সাধন করে থাকে, তাহলে আনুপাতিক হারে মূল্য হ্রাস বৈধ;

৫. পণ্য একসাথে ক্রয় করলে আংশিক বিক্রয় ঠিক হবে না;

৬. সরবরাহকারী হতে ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত পণ্য দখলে নেয়ার পর তা গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করা বৈধ হবে; অন্যথায় নয়;

৭. পণ্যের মূল্য সরবরাহকারীর হাতেই দিতে হবে। গ্রাহককে দিলে বৈধ হবে না;

৮. উভয়ের মধ্যে দুটি পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে, প্রথমটি ওয়াদ বিশ শিরা (পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার) আর দ্বিতীয়টি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি।

উল্লেখ্য, সরবরাহকারীর নিকট হতে ক্রয়কৃত পণ্য গ্রাহক ওয়াদ বিশ শিরা বা ক্রয়ের ওয়াদা করার কারণে নিতে বাধ্য থাকবেই এমনটি চুক্তি হলে বায়'উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতির ক্রয় বিক্রয় বৈধ হবে না। এর অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে, এই ওয়াদা যদি চূড়ান্তভাবে পালন করতেই হয় তাহলে এ দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রাহকের ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিই সম্পন্ন হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান উক্ত গ্রাহকের সাথে এমন কিছু বিক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যার মূল মালিকানা এখনো উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্জন করতে পারেনি। আর যা মালিকানায় আসেনি তা বিক্রয় ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। সরবরাহকারীর নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে বুঝে নেয়ার পরেই তা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা যাবে; তার পূর্বে নয়।

৯. Down payment : (عربون) অর্থাৎ মূল্যের অংশবিশেষ গ্রাহক থেকে নেয়া এ ক্রয়-বিক্রয়ে বৈধ। তবে তা সরবরাহকারীর নিকট থেকে পণ্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দখলে আসার পরে। এক্ষেত্রে অগ্রিম চেক নিতে হলেও তাতে স্বাক্ষর হতে হবে পণ্য ব্যাংকের দখলে আসার পরে। অন্যথায় ঐ পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে, যা ব্যাংকের মালিকানার বহির্ভূত। আর এমন পণ্য যা ব্যাংকের মালিকানায় আসেনি, তা ইসলামী শরীআহ বিক্রয় বৈধ নয়।

১০. গ্যারান্টি রাখা : ক্রেতার নিকট থেকে বাকি মূল্য উসূল করার জন্য তার কোন সম্পদ বন্ধক রাখা অথবা তার পক্ষ থেকে অন্য কাউকে জামিন রাখা বৈধ, যাকে কাফীল বলা হয়। বন্ধকী সম্পদ ব্যবহার করে তা থেকে ফায়দা ওঠানো সুদের নামান্তর।[৩] একইভাবে এ বন্ধক উক্ত পণ্য সরবরাহকারীর নিকট থেকে ব্যাংকের দখলে আসার পর হস্তান্তর হতে হবে।

এই ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার অনিবার্য শর্তটি হচ্ছে পণ্য ব্যাংকের দখলে আসার পর গ্রাহক উক্ত পণ্য নিতে বাধ্য থাকবে এমন কোন চুক্তি সম্পাদন না হওয়া।[৪] কারণ

---

৩. মুহাম্মদ তাকী উছমানী, *ফিকহী মাকলাত* (দেওবন্দ, ১৯৯৫), খ. ১, পৃ. ৮৬-৮৭

৪. এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কোনো কোনো আধুনিক ইসলামী ফকীহ ও চিন্তাবিদ এরূপ মত পোষণ করে থাকেন। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞ আধুনিক ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, এ জাতীয় বেচাকেনায় ব্যাংক ও গ্রাহক দু পক্ষই নিজ নিজ চুক্তি প্রতিপালনে বাধ্য থাকবে। এ জাতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ড. সামী হাম্মুদ, ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ড. আহমদ আলী আস-সালূস, ড. সিদ্দীক মুহাম্মাদ আল-আমীন, ড. মুহাম্মাদ আল-বাদাভী, ড. ইব্রাহীম ফাযিল আদ্‌দবু, শায়খ মুহাম্মদ 'আলী আত-তাসখীরী, শায়খ মুহাম্মাদ 'আবদুহু 'উমার, শায়খ 'আবদুস সাত্তার আবূ গুদ্দাহ, শায়খ 'আবদুল হামিদ আস-সা'য়িহ, ড. মুহাম্মদ 'উমার শাবিরা এবং আরো অনেকেই। বিস্তারিতের জন্য দেখুন, ড. মুহাম্মাদ সারসূরের লিখিত 'بيع المرابحة للآمر بالشراء'।

আমরা মনে করি যে, ক্রয়ের ওয়াদা করার পর তা পালন করা বাধ্যতামূলক না হওয়া মর্মে প্রবন্ধকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ কথা ইসলামের মূল আদর্শেরও পরিপন্থী। ইসলামের আলোকে প্রত্যেক মু'মিনই তার প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পালন করতে নৈতিক ও আইনগতভাবে বাধ্য। যে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার বাধ্যবাধকতা নেই, তা হলে সে প্রতিশ্রুতি করার শর্ত আরোপ করার প্রয়োজন কী?! তাছাড়া বেচাকেনার অগ্রিম অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং চূড়ান্তভাবে ক্রয়বিক্রয় সম্পাদন করা এক কথা নয়। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে কুয়েতে ওআইসি ফিক্‌হ একাডেমির সম্মেলনে 'মুরাবাহা লিল আমির বিশশিরা ও ওয়াদা পরিপালন সম্পর্কে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "কোনো পণ্যের ওপর শারী'আহসম্মত উপায়ে অর্ডারপ্রাপ্ত বিক্রেতার মালিকানা ও দখল লাভের পর 'মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরা'র ভিত্তিতে বিক্রি করা হলে তা বৈধ ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হবে। শর্ত হচ্ছে, (অর্ডারদাতা) ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের পূর্বে পণ্য নষ্ট হলে তার দায়দায়িত্ব (অর্ডারপ্রাপ্ত) বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। ... এখানে ওয়াদাকারীর জন্য ওয়াদা পালন দীনী দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক; তবে কোনো ওযর

এহেন পরিস্থিতিতে গ্রাহক উক্ত পণ্য যদি ক্রয় করতে বাধ্য হয়ে থাকে, তাহলে তা মূলত ক্রয় বিক্রয় পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ারই নামান্তর। আর পণ্য তো সরবরাহকারীর নিকট হতে ক্রয়ের পরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দখলে পেলেও ওয়াদ বিশ শিরার সময়ে চুক্তি পালন যদি গ্রাহকের জন্য অপরিহার্য হয়ে থাকে, তাহলে ঐ সময়েই ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হবে। অথচ তখন উক্ত পণ্য ব্যাংকের দখলে আসে না। অতএব, ব্যাংক দখলে না আসা পণ্য বিক্রয় করার কারণে এই পরিস্থিতিতে শারীআহের দৃষ্টিতে ক্রয় বিক্রয় বৈধ হয়নি বলার অবকাশ আছে।[৫]

বায়'উল মুরাবাহাতি লিল আমিরি বিশশিরা বৈধ হওয়ার দলীলসমূহ

১. ইবন আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. মদীনাতে এমন সময় আগমন করলেন যখন মদীনাবাসীগণ এক বা দু বছরের মেয়াদে বাকিতে; বর্ণনাকারী ইসমাইল সন্দেহ করে বলেন, দুই অথবা তিন বছরের মেয়াদে খেজুর সালাম পদ্ধতিতে (মূল্য অগ্রিম ও পণ্য বাকিতে) বেচাকেনা করতেন। এ বিষয়ে তিনি বললেন,

مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.

যে ব্যক্তি খেজুরের সালাম করতে চায়, সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওযনে সালাম করে।[৬]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বর্তমানের মূল্য অনুযায়ী সালাম করতে শর্ত করেননি। সুতরাং বাকিতে বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে কোন বাধা নেই।

২. আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. তাকে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় উটের কমতি দেখা দিল। তখন

থাকলে ভিন্ন কথা।" (ইসলামী ফিকহ একাডেমি, পঞ্চম অধিবেশন, কুয়েত, ডিসেম্বর ১৯৮৮, সিদ্ধান্ত নং: ৪০-৪১ (৫/২ ও ৫/৩) মার্চ ১৯৮৩ সালে কুয়েতে ইসলামী ব্যাংক সম্মেলনে গঠিত ফকীহদের বিশেষ কমিটি এ সম্পর্কে সুপারিশ করে যে, "ক্রয়কৃত পণ্যের মালিকানা ও দখল লাভের পর 'মুরাবাহা লিল আমির বিশশিরা'র ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয়ের জন্য পারস্পরিক ওয়াদা করা এবং উক্ত ওয়াদাপত্রে লাভে ক্রয়ের আদেশদাতার কাছে বিক্রি করা শরীআহসম্মত। ... উল্লেখিত ওয়াদা গ্রাহক অথবা ব্যাংক কিংবা উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কল্যাণকর ও লেনদেনে শৃঙ্খলার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। এতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তা বাধ্যতামূলক করাটা শরীআহের দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য। .."(ড. আলী আহমাদ আস-সালুস, *মাওসূ'আতুল কাদায়া আল-ফিকহিয়্যাহ আল-মু'আছারাহ ওয়াল ইকতিসাদিল ইসলামী* (কাতার: দারুস সাকাফাহ), পৃ. ৬০১) (নির্বাহী সম্পাদক)।

৫. http://alkafeel.net/islamiclibrary

৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আল জামি' আছছাহীহ* (বৈরূত: দারুত তাউক, ১৪২২ হি.), কিতাবুস সালাম, বাবুস সালাম ফী কাইলিন মা'লুম, খ. ২, পৃ. ৭৮১, হাদীস নং ২২৩৯

রাসূলুল্লাহ স. তাকে যাকাতের জওয়ান উট নেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি যাকাতের উট না আসা পর্যন্ত বাকিতে দুটি উটের বিনিময়ে একটি করে উট ক্রয় করলেন।[৭]

ইবনুল মুসায়্যিব বলেন,

لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل

বাকিতে দুটি উটের পরিবর্তে একটি উট বা দু'টি ছাগলের পরিবর্তে একটি ছাগল নিলে তাতে সুদ নেই।[৮]

এখানে বাকিতে দুটির বিনিময়ে একটি করে গ্রহণ করাকে বৈধ বলা হয়েছে। সুতরাং বাকিতে বেশি মূল্যে বিক্রয় করা ইসলামী শরীআহ কোন দোষের নয়।

৩. আয়িশা রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা রা. এসে বললেন-

إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ...

"আমি প্রতি বছর এক উকিয়া করে নয় উকিয়া আদায় করার শর্তে কিতাবাতের চুক্তি করেছি। ..."[৯]

এ হাদীসে কিস্তিতে আযাদ হওয়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ স.-এর সামনে উপস্থাপন করা হলে তিনি এটিকে অস্বীকার করেননি। সুতরাং এদ্বারা আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয় বৈধ বলে প্রমাণিত।

৪. 'আয়িশাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

রাসূলুল্লাহ স. এক ইয়াহুদীর নিকট হতে নিজের লৌহের বর্ম বন্ধক রেখে বাকিতে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন।[১০]

ইয়াহুদীগণ অর্থলিপ্সু। তারা বাকিতে বর্তমান দামে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট খাদ্য বিক্রয় করেছিল এটি বিশ্বাস্য নয়। বরং সে অতিরিক্ত মূল্য নিয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ

---

৭. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আস, *সুনান আবূ দাউদ* (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, সনবিহীন), কিতাবুল বুয়ু', বাবুন ফীর রুখসাতি ফী জালিক, খ. ৩, পৃ. ২৫৬, হাদীস নং ৩৩৫৯

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاَصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

৮. বুখারী, *আস সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৭৬

৯. বুখারী, *আস সহীহ*, খ. ২, পৃ.৭৫৯; মুসলিম, *আস সহীহ* (বৈরূতঃ দারুল জিল ও দারুল আফাকিল জাদীদাহ, তা বি.), খ. ৪, পৃ. ২১৪, মুনীব ও দাসের মধ্যে আযাদ করে দেয়ার চুক্তিকে কিতাবাত বলে।

১০. বুখারী, *আস সহীহ*, খ. ২, পৃ. ২৭৯

স. তারপরেও উক্ত ইয়াহুদী থেকে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায়, বাকিতে বেশি দামে পণ্য বিক্রয় বৈধ। সুতরাং 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' শরীআহসম্মত একটি লেনদেন। অপরদিকে বাকিতে পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য লাভজনক। বিক্রেতার জন্য লাভ হচ্ছে সে বেশি লাভ করল আর ক্রেতার জন্য লাভজনক সে পরিশোধের জন্য বেশি সময় পেল। সেজন্য বাকিতে বেশি মূল্যে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে আপত্তির কিছু নেই।

৫. প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ সব অনেক সময় কারো কারো থাকে না। যদি বাকিতে ক্রয়কে অবৈধ করে দেয়া হয়, বিক্রেতা নিশ্চয় নগদ মূল্য ছাড়া বাকিতে বিক্রয় করবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ দুরূহ হয়ে পড়বে। মানুষকে কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্ত করে জীবনকে সহজসাধ্য করা ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

"আর নির্ধারণের পর যে ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সম্মত হবে তাতে তোমাদের উপর কোন অপরাধ নেই।"[১১]

তিনি আরো বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না।"[১২]

তিনি অন্যত্র আরো বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।"[১৩]

রাসূলুল্লাহ স. মু'আয ও আবূ মূসাকে য়ামানে পাঠানোর সময়ে বলেছিলেন, يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا। সহজ করো, কঠিন করো না।[১৪] তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

"তোমাদেরকে সহজকারী করে প্রেরণ করা হয়েছে, কঠিনকারী হিসেবে নয়।"[১৫]

তার অর্থ এটা নয় যে শরীআহের সবকিছু সহজ করে দেয়া হবে। যেহেতু ইসলামী শরীআহ এ ক্রয়-বিক্রয় হারাম বলে কোথাও উল্লেখ নেই, সেহেতু মু'আমালা হিসেবে

---

১১. আল-কুরআন, ৪ : ২৪
১২. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫
১৩. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮
১৪. বুখারী, *আস সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১১০৪
১৫. আবূ দাঊদ, *আসসুনান*, খ. ১, পৃ. ১৯৫

এটি বৈধ। কেননা হারামকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,[১৬]

﴿وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমাদের এ কি হয়েছে! তোমরা সেসব (জন্তুর গোশত) কেন খাবে না, যা জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, (বিশেষ করে যখন) তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, তিনি তোমাদের ওপর কোন্ কোন্ বস্তু হারাম করেছেন। সে কথা অবশ্যই আলাদা যখন তোমাদের তার ব্যাপারে একান্ত বাধ্য (ও নিরূপায়) করা হয়। অধিকাংশ মানুষ সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো (মানুষকে) বিপথে চালিত করে। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালো করেই জানেন।"

সুতরাং যা হারামের বর্ণনায় নেই তা হালাল।

যারা বাকিতে বিক্রয়ে নগদের চেয়ে বেশি নেয়াকে অবৈধ বলেন, তাদের একমাত্র যুক্তি হচ্ছে, এ লেনদেনে সময় বাড়িয়ে দেয়ার কারণে ঋণের অংকও বাড়িয়ে দেয়া হয়, যা মূলত সুদ। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের এ যুক্তি সঠিক নয়। বড়জোর এতটুকু বলা যায়, এখানে সময় বাড়িয়ে দিয়ে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়া হয়। সময় বাড়ানোর বিপরীতে ঋণের অংক বাড়ানো আর সময় বাড়ানোর বিপরীতে পণ্যের মূল্য বাড়ানো কখনো এক নয়। এখানে বিষয়টি হচ্ছে, বিক্রেতা বলে থাকে যে, আমি এ পণ্য বাকিতেই বিক্রয় করব; তবে এই অংক ছাড়া বিক্রয় করব না। আসলে সময়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকে না। তবে হ্যাঁ, সে যদি বলত যে, আমি এ পণ্য এই মূল্য ছাড়া বিক্রয় করব না। তারপর মূল্য পরিশোধের সময় বাড়িয়ে মূল্যও বাড়িয়ে দিত, তাহলে তা নিঃসন্দেহে সুদ বলেই গণ্য হত। কেননা তখন সে সময় বাড়িয়ে দেয়ার বিপরীতে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিল বলে ধরা যেত, যা সুদেরই নামান্তর। তবে প্রথম থেকেই সময়ের সাথে পণ্যের মূল্যকে না জড়িয়ে এমনিতে বাড়িয়ে ধরলে শরীআহ এর কোন আপত্তি নেই। তবে এই ক্রয় বিক্রয় সুদমুক্ত হওয়ার জন্য আরো কিছু শর্তাবলি রয়েছে, যা আমরা পরে আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ।

১. এই ক্রয় বিক্রয় বিদগ্ধ ফকীহদের বৈধতা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় বৈধ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিদগ্ধ ফকীহদের বক্তব্য হচ্ছে-

---

১৬. আল-কুরআন, ৬ : ১১৯

❖ ইমাম আশ-শাফি'ঈ রহ. বলেন,

وإذا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فقال اشْتَرِ هذه وَأُرْبِحْكَ فيها كَذَا فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ.

এক ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তিকে একটি পণ্য দেখিয়ে বলেন, তুমি আমাকে এটি ক্রয় করে দাও এবং আমি তোমাকে এই পরিমাণ লাভ দেব। উক্ত ব্যক্তি যদি তাকে সে পণ্যটি ক্রয় করে দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে।[১৭]

❖ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী আল-হানাফীকে আস-সারাখসীর বর্ণনা মতে প্রশ্ন করা হয়েছিল-

أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارًا بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بـألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها، فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك؟ قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام (...) وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، فيدفع عنه الضرر بذلك.

"এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নির্দেশ দিল এই বলে যে, এক হাজার দিরহামে একটি বাড়ি সে তাকে ক্রয় করে দিবে এবং সে তা থেকে এক হাজার দুইশত দিরহামে তা ক্রয় করে নিবে। তখন নির্দেশিত ব্যক্তি সেটি ক্রয় করল এবং পরে সে আশঙ্কা করল যে, হয়ত নির্দেশদাতা এটি নাও নিতে পারে, তখন সে বাড়িটি যাকে কিনে দিতে বলা হয়েছিল তার নিকটেই থেকে যাবে। এরূপ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ কী? তখন তিনি (আশ-শায়বানী) এই বলে সমাধান দেন যে, নির্দেশিত ব্যক্তি বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি এই শর্তে ক্রয় করবে যে, আমি তিন দিনের মধ্যে এটি প্রয়োজন না হলে ফেরত দিতে পারব, সেই অধিকার চাচ্ছি। যদি নির্দেশদাতা সেটি ক্রয় করতে না চান, তাহলে কথামত তিন দিনের মধ্যে বিক্রেতাকে নির্দেশিত ব্যক্তি তা ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষতির হাত থেকে নিজে রক্ষা পাবে।"[১৮]

এখানে মূলত আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলা হয়েছে।

❖ ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, তিনিও উপরে বর্ণিত শায়বানীর মতই এ ধরনের ক্রয় বিক্রয়কে বৈধ মনে করেন।[১৯] সুতরাং এ সকল ফকীহ 'আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' ক্রয়-বিক্রয়কে যে বৈধতা দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

১৭. আশ-শাফি'ঈ, *আল উম্ম* (বৈরূত: ১৩৯৩হি.), খ. .., পৃ. ৩৩৯

১৮. মাজমা'উল ফিকহুল ইসলামী, *মাজাল্লাতু মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, জিদ্দা, খ. ৫, পৃ. ৮৪৯, আশশায়বানীর আল-হিয়াল গ্রন্থের পৃ. ৭৯ হতে সংগৃহীত

১৯. ইবনুল কায়্যিম, *ই'লামুল মুওয়াককি'ঈন* (বৈরূত: ১৯৭৩), খ. ৪, পৃ. ৩০

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা মূলত (الاستصناع) (অর্ডার নিয়ে কোন কিছু তৈরি করে দেয়া) লেনদেনের মত। আর তা হচ্ছে কোন কিছু বানানোর জন্য ক্রেতা প্রস্তুতকারীকে অর্ডার দেয়। অর্ডার মত সে পণ্য তৈরি করলো। উক্ত ক্রেতার জন্য অর্ডারদাতা তা ক্রয় করে নিল। এটি যেমন বৈধ, আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরাও তেমন বৈধ। আল ইসতিছনা লেনদেনে যেমন প্রথমত পণ্যের অস্তিত্ব ছিল না, এ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও পণ্যের অবস্থা ছিল একই। সেটি বৈধ হলে এটিও বৈধ। সুতরাং উপরোল্লিখিত দলীলাদির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

সংশয় নিরসন

এখানে 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' যেমন অনেক বিদগ্ধ ফকীহের কাছে বৈধ বলে আলোচিত হলো, তেমনি এই ধরনের ক্রয় বিক্রয়ের বৈধতা নিয়ে কোন মুসলিম মনীষীর সন্দেহ সংশয়েরও উদ্রেক হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে সেই সন্দেহ সংশয়গুলো উপস্থাপন করে সেগুলোকে নিরসন করা হলো:

সন্দেহ-১ : এটি বায়'উল 'ঈনা

কারো কারো মতে এ লেনদেন বায়'উল 'ঈনার অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য এ লেনদেন অবৈধ। ফকীহদের নিকট বায়'উল 'ঈনা হচ্ছে দুটি ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেনের নাম, যার প্রথমটিতে যিনি বিক্রেতা থাকবেন, পরেরটিতে তিনি ক্রেতা হয়ে যান। একইভাবে প্রথমটিতে যিনি ক্রেতা থাকেন, পরেরটিতে তিনি বিক্রেতা হয়ে যান। আর পণ্যের মূল্যের দিক থেকে প্রথমটিতে বাকি মূল্যে বেশি দামে বিক্রয় হয় এবং দ্বিতীয়টিতে তা থেকে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। যেমন-

প্রথম ক্রয়-বিক্রয় : ক্রেতা 'ক', বিক্রেতা 'খ', ও পণ্য 'গ' যার মূল্য বাকিতে এক হাজার টাকা

দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় : ক্রেতা 'খ', বিক্রেতা 'ক', ও পূর্বেরই 'গ' পণ্যকে নগদ আটশত টাকা মূল্যে বিক্রয় করল। অর্থাৎ 'ক' এর নিকট 'খ' প্রথম 'গ' = একমন চাল বিক্রয় করল বাকিতে এক হাজার টাকায়। পরে 'খ' এর নিকট 'ক' ঐ একই পণ্য নগদে বিক্রয় করল আটশত টাকায়। সুতরাং প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ে 'ক' পণ্যের মূল্য পরে পরিশোধ করবে বিধায় তা ক্রয় করল এক হাজার টাকায় আর দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয়ে 'খ' পণ্যের মূল্য নগদে পরিশোধ করার কারণে 'ক' কে দিল আটশত টাকা। বাস্তবে 'খ' প্রথম থেকেই পণ্যের মালিক ছিল, এখনও মালিকই থাকল। মাঝখানে টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন হল মাত্র। সেখানে যে দুইশত টাকা বেশি নেয়া হল তা মূলত সুদ (ربا النسيئة)। 'খ' হল সুদ গ্রহীতা আর 'ক' হল সুদদাতা। এ ক্রয় বিক্রয় হারাম। 'ঈনা নগদ অর্থকে বুঝায়। এখানে মূল উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয় নয়; নগদ অর্থ।

সেজন্য একে বায়'উল 'ঈনা বলা হয়। কথিত আছে, এটির মূল শব্দ এসেছে আল আ'উন থেকে অর্থাৎ সাহায্য, বিক্রেতা আসল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্রেতার সাহায্য সহযোগিতা নেয়, সেজন্য একে বায়'উল 'ঈনা বলে। কারো কারো মতে, এটি আল'আনাত হতে উদ্ভুত, যার অর্থ কষ্ট স্বীকার করা।[২০] অনেক কষ্টে এ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলে একে বায়'উল 'ঈনা বলা হয়। এর অর্থ ঋণও হয়।[২১] এর অর্থ চোখে দেখা যাচ্ছে এমন পণ্য।[২২]

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকট এই ক্রয় বিক্রয়ের লেনদেনটি ফাসিদ। প্রথমটি শুদ্ধ। ইমাম মালিক ও আহমাদ রহ. প্রমুখের নিকট উভয় লেনদেনই বাতিল।[২৩] তবে ইমাম আশ-শাফি'ঈ একে মাকরূহ বলেছেন।[২৪] আয-যুহায়লী বলেছেন, শাফি'ঈর এ মত প্রত্যাখ্যাত। কেননা এটি স্পষ্টত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। সে কারণে আশ-শাফি'ঈর এ মত কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।[২৫]

সন্দেহ নিরসন : 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' আর 'বায়'উল 'ঈনা' এক নয়। কেননা বায়'উল 'ঈনাতে একই পণ্যের একবার যে ক্রেতা হয় পরবর্তীতে সে হয় বিক্রেতা এবং সেখানেই প্রথম ক্রয়-বিক্রয়টি দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রত্যক্ষ শর্ত বলে উল্লেখ থাকে, যা 'আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' ক্রয়-বিক্রয়ে থাকে না। এখানে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্রেতা থাকে তৃতীয় অন্য ব্যক্তি, একইভাবে প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয় অবৈধ হওয়ার মত শর্তযুক্ত কোন কিছু জড়িত থাকে না। 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা'তে প্রথম বিক্রেতাই পুনরায় একই পণ্যের মালিক হয় না, বরং তার মালিক হয় অন্য তৃতীয় ব্যক্তি (গ্রাহক)। পক্ষান্তরে বায়'উল 'ঈনাতে প্রথম বিক্রেতাই পুনরায় ঐ পণ্যের মালিক হয়। সুতরাং দুটি এক নয়। সেজন্য বায়'উল 'ঈনা অবৈধ হলেও আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন বৈধ।

সন্দেহ-২ : একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয় বিক্রয়

একই ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয় (صَفْقَتَان فِي صَفْقَة وَاحِدَة) অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশর্শিরা' অবৈধ। একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয়ের উদাহরণ হচ্ছে, একজন ৫০ কেজি চাল ২০০০ টাকায় একমাস

---

২০. আল খাত্তাব আল'আয়নী, *মাওয়াহিবুল জালীল* (বৈরূত: ১৪২৩ হি.), খ. ৬, পৃ. ২৯৩

২১. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত: তাবি.), খ. ১৩, পৃ. ২৯৮

২২. ইবন ফারিস, *মু'জামু মাকায়িসুল লুগাহ* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ২০০

২৩. আবূল মুযাফফার য়াহইয়া আশ শায়বানী, *ইখতিলাফুল আইম্মাতিল উলামা* (বৈরূত: ১৪২৩ হি.), খ. ১, পৃ. ৪০৪

২৪. আযযুহায়লী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিললাতুহু*, খ. ৫, পৃ. ১৪৮

২৫. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪০

পরে সরবরাহ করা হবে শর্তে ক্রয় করল। নির্ধারিত সময়ে বিক্রেতা বলল, তুমি আমাকে আরো একমাস সময় দাও আমি তোমাকে ৫৫ কেজি চাল দিয়ে দেব। এটি মূলত একই লেনদেনে অন্য আরো একটি লেনদেন সংযুক্ত হয়ে দুই লেনদেন অনুষ্ঠিত হওয়ায় অতিরিক্ত ৫ কেজি চাল এখানে সুদ হিসেবে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا.

যে একই ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে দুই ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করল, তার জন্য উভয়ের মধ্যে নিম্নমূল্য গ্রহণ বৈধ হবে। অন্যথায় তা সুদ বলে গণ্য হবে।[২৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ.

রাসূলুল্লাহ স. একই লেনদেনের মধ্যে দুই লেনদেনকে নিষিদ্ধ করেছেন।[২৭]

এ দুই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, একই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুটি ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।

সন্দেহ নিরসন

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতি এবং একই ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি ক্রয়-বিক্রয় বা একই লেনদেনে দুটি লেনদেন পদ্ধতি এক নয়। ইমাম শাফি'ঈ রহ. একই ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি ক্রয়-বিক্রয় বলতে নিম্নলিখিত ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝিয়েছেন-

ক. বিক্রেতার পক্ষ হতে একই পণ্য বাকিতে হলে এত ও নগদে হলে এত টাকায় বিক্রয় করার প্রস্তাব দেয়া। কোন সন্দেহ নেই যে, মূল্য স্থির না হওয়ায় এ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ. বিক্রেতার পক্ষ হতে এইভাবে বলা যে, আমি আমার এই জমিটি একলক্ষ টাকায় অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করলাম, যাতে সে আমার কাছে তার গাভীটি বিক্রয় করে। তাছাড়াও ইসলামী শরীআহর দৃষ্টিতে একই ক্রয় বিক্রয়ে দুটি ক্রয় বিক্রয় বলতে অন্য পদ্ধতিও বোঝায়, যা ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তা হচ্ছে, এক ব্যক্তি ৫০ কেজি চাল একমাস পরে সরবরাহ করা হবে শর্তে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করল। নির্ধারিত সময় ৫০ কেজি চাল দিতে না পারায় সে আরো একমাস সময় বাড়িয়ে ৫৫ কেজি চাল দেয়ার নতুন চুক্তি করল। এখানে অতিরিক্ত ৫ কেজি অবশ্যই সুদ বলে গণ্য হবে।

---

২৬. আবূ দাউদ, *আস সুনান*, খ. ৩, পৃ. ২৯০, আল হাকিম, *মুসতাদরাক আলাস সাহীহায়ীন*, (বৈরূত: ১৪১১ হি.), খ. ২, পৃ. ৫২

২৭. আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, খ. ৬, পৃ. ৩২৪

উপরোল্লিখিত কোন পদ্ধতির সাথে 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' পদ্ধতির মিল নেই। এখানে উল্লেখিত প্রত্যেকটি পদ্ধতিতে ক্রেতা-বিক্রেতা মাত্র দুজনই উভয়ের মধ্যে এই লেনদেন দুই লেনদেন পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' পদ্ধতিতে একই ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝখানে একই লেনদেনের মধ্যে দুটি লেনদেন নয়; বরং প্রতিষ্ঠান ও সরবরাহকারীর মধ্যে একটি লেনদেন আর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে দ্বিতীয় লেনদেন পৃথক পৃথকভাবে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং কোনভাবেই এটি একই লেনদেনে দু'টি লেনদেন হতে পারে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন লেনদেন, যাদের পক্ষও ভিন্ন ভিন্ন। সেজন্য একই লেনদেনে দু'টি লেনদেন মনে করে 'আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা'কে অবৈধ বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

সন্দেহ-৩ : পণ্যের অধিকার পাওয়ার আগে বিক্রয়

'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' পদ্ধতি মূলত যে পণ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি তা বিক্রয়েরই নামান্তর। আর যে পণ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি অথবা দখলে আসেনি তা বিক্রয় করা যেহেতু শরীআহ বৈধ নয়, সেহেতু আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরাও বৈধ নয়। যে পণ্যের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত নেই তা বিক্রয় যে বৈধ নয় সে সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ».

হাকীম ইবন হিযাম রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে যা বিক্রয়ের জন্য আমার নিকট নেই এমন কিছু আমার থেকে ক্রয় করতে চায়। এরপর আমি তার কাছে তা বাজার থেকে এনে বিক্রয় করি। তিনি বললেন "যা তোমার কাছে নেই তা তুমি বিক্রয় করো না।[২৮]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে-

عن حَكِيمِ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

হাকীম ইবন হিযাম রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি অনেক পণ্য ক্রয় বিক্রয় করি তন্মধ্যে কী হালাল রয়েছে আর কী হারাম রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি কোন পণ্য ক্রয় করলে যতক্ষণ না তা তুমি দখলে নিতে পারবে ততক্ষণ তা বিক্রয় করবে না।[২৯]

---

২৮. আবূ দাউদ, *আস সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩০২; আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, খ. ২৪, পৃ. ২৬; ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, (বৈরূত: তাবি), খ. ২, পৃ. ৭৩৭; আত তিরমিযী, *সুনান*, (বৈরূত: তাবি), খ. ৩, পৃ. ৫৩৪

২৯. আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, খ. ২৪, পৃ. ৩২

যেহেতু আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয়ে কোন পণ্য দখলে না নিয়েই বিক্রয় করা হয়, সেহেতু এ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।

সন্দেহ নিরসন

'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' ও এখানে উল্লেখিত যে পণ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি তা বিক্রয় করা এক নয়। আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতিতে দুটি ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়। প্রথমটি হয় ব্যাংক ও পণ্য সরবরাহকারীর মধ্যে। সেখানে ব্যাংক সরবরাহকারীকে মূল্য পরিশোধ করে তার থেকে পণ্য নিজের দখলে নিয়ে নেয়। ব্যাংক উক্ত পণ্যের মালিক হয়। উক্ত পণ্য সে সময়ে নষ্ট হয়ে গেলে তার ঝুঁকিও ব্যাংককে বহন করতে হয় এমন পরিস্থিতিতে ব্যাংক তার গ্রাহককে উক্ত পণ্য নির্ধারিত লভ্যাংশ যুক্ত করে বাকিতে বিক্রয় করে। সুতরাং আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে পণ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বিক্রয় হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। উল্লেখ্য, যদি ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারী থেকে বুঝে নেয়ার পূর্বেই তা গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে তা অবশ্যই বৈধ হবে না। সে ত্রুটি এ পদ্ধতির নয়, সে ত্রুটি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার। একইভাবে গ্রাহকের ক্রয় করার প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক তার কাছে যা নেই তা কিন্তু তার কাছে বিক্রয় করে না। সে সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করে এনে দ্বিতীয় লেনদেনের মাধ্যমে তার সাথে ক্রয় বিক্রয় লেনদেন করে। সুতরাং ব্যাংক গ্রাহকের কাছে কোন পণ্যের মালিক না হয়েই বিক্রয় করে এমন কথা ঠিক নয়।

যাই হোক, এখানে বিক্রেতার নিকট নেই এমন কোন পণ্য সম্পর্কে তার উক্তি "আমি অমুক পণ্য অমুক মূল্যে তোমার নিকট বিক্রয় করলাম" এবং গ্রাহকের পক্ষ থেকে ব্যাংককে বলা "আমি অমুক পণ্য ক্রয় করতে সম্মত আছি, আপনি তা আমাকে ক্রয় করে দিন" উভয় বক্তব্যের ভিতর অনেক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটিতে পণ্য অনুপস্থিত, তবে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে, যা অবৈধ। আর দ্বিতীয়টিতে তো ক্রয় বিক্রয় সম্পন্নই হয়নি, সে সময়ে পণ্যের অস্তিত্ব থাকা না থাকার প্রশ্ন অবান্তর। সুতরাং দুটি বিষয় কখনো এক নয়। সেজন্য যা দখলে নেই, আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয় বিক্রয়ে তাই-ই বিক্রয় করা হয় বিষয়টি তেমন নয়। বরং পণ্য দখলে এনেই তা বিক্রয় করা হয়। সেজন্য এ ক্রয় বিক্রয় বৈধ।

সন্দেহ ৪ : ঋণের উপর অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয়ে ঋণের উপর অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হয়। কোন ব্যবসায়ী অন্য কারো জন্য কোন পণ্য নগদে ক্রয় করে তা উক্ত ব্যক্তির নিকট মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় করার অর্থই হচ্ছে সুদ। এ প্রসঙ্গে আবুল ওয়ালিদ সুলায়মান আলবাজী বলেন:

لأَنَّهُ يَبْتَاعُ لَهُ الْبَعِيرَ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ بِعِشْرِينَ إِلَى أَجَلٍ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ سَلَّفَهُ عَشَرَةً فِي عِشْرِينَ إِلَى أَجَلٍ.

> একজন অন্যজনকে তার জন্য দশ দিরহাম দিয়ে একটি উট এই শর্তে ক্রয় করতে বলে যে, সে তা বাকিতে তার থেকে বিশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করবে। এর অর্থ হচ্ছে, সে তা থেকে দশ দিরহাম ঋণ হিসেবে গ্রহণ করল আর তা (পরিশোধের জন্য সময় নিয়ে) তা বিশ দিরহাম হিসেবে পরিশোধ করল।[৩০]

এখানে একটি উট দশের বিনিময়ে ক্রয়ের নির্দেশ পেয়ে তা ক্রয় করে উক্ত ব্যক্তিকে বিশ টাকায় বিক্রয় করা মূলত পরিশোধের ক্ষেত্রে সময় বাড়িয়ে দেয়ার কারণেই হয়েছে, যা মূলত সুদেরই নামান্তর।

সন্দেহ নিরসন

এক্ষেত্রে দুটি পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে আল বাজীর বর্ণনা মতে, উক্ত উট মূলত আমিরের (ক্রয়ের নির্দেশ দাতার) জন্যই দশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে তা ঐ একই ব্যক্তির নিকট বাকিতে পরিশোধ করার সুযোগ দেয়া হবে বিধায় তা বিশের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়েছে। এখানে ক্রেতার পক্ষ হতে দশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করার শর্ত দিয়ে দেয়ায় এ লেনদেন অবৈধ। এটা সুদী লেনদেন সে বিষয়ে আমরাও একমত। তবে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরাতে ব্যাংক প্রথমত পণ্য নিজেই মালিক হওয়ার জন্য নগদে নিজের টাকা দিয়েই ক্রয় করে যেখানে উক্ত পণ্যের মূল্য কত হবে তা নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয় না। সুতরাং ব্যাংক নিজের জন্য কমমূল্যে ক্রয়কৃত কোন পণ্য আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা বা ক্রয় করে দেয়ার নির্দেশদাতার নিকট বেশি দামে বিক্রয় করা অবশ্যই বৈধ। পূর্বোল্লিখিত আল বাজীর বর্ণনায় আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়ের জন্য দশ দিরহাম নির্ধারণ করে দেয়া মূলত এটি তিনি ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলে ধর্তব্য, পরে তা বিশ দিরহামে বাকি ক্রয়ের অর্থই হচ্ছে অতিরিক্ত দশ টাকা ঋণের টাকার উপর বেশি দেয়া সুতরাং সেটি সুদ। পক্ষান্তরে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রয়কৃত পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ব্যাংক নিজেই ক্রয় করে তার উপর লভ্যাংশ যোগ করে বিক্রয় করা মূলত আল বাজীর বর্ণিত পদ্ধতি থেকে একেবারেই ভিন্ন। এটির পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ার কারণে এ লেনদেনের লভ্যাংশ সুদ হিসেবে পরিগণিত হয় না। সুতরাং ঐ লেনদেন শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ। আল বাজীর পদ্ধতিতে দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয়টি ফকীহদের নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতিতে দুটি ভিন্ন ভিন্ন লেনদেন উভয়টি বৈধ বলেই গণ্য। অপরদিকে বাকিতে বিক্রয় হওয়ার কারণে সময় বাড়ানোর বিনিময়ে যে মূল্য বেশি নেয়া হচ্ছে বিষয়টি তেমন নয়।

---

৩০. আবুল ওয়ালিদ সুলায়মান ইবন খালফ আল-বাজী, *আল-মুনতাকা ফী শারহি মুয়াত্তা*, খ. ৩, পৃ. ৪৩৯

সন্দেহকারীদের মতে, সময় বাড়ানোর বিনিময়ে অর্থ বেশি নেয়া প্রত্যক্ষভাবে সময় বাড়ানোর মূল্য হিসেবে নেয়া হয়েছে ধারণা করা এজন্য সঠিক নয় যে, সময় বাড়ানোর কারণে পরোক্ষভাবে পণ্যের মূল্য বাড়তে পারে, যে বৃদ্ধিটি সরাসরি সময়ের বিনিময়ে নয় বরং পণ্যের বিশেষ গুণের কারণে। পশুর পেটের বাচ্চা পৃথকভাবে বিক্রয় করা বৈধ নয়; তবে পশুর পেটে বাচ্চা থাকার কারণে পশুর মূল্য বাড়িয়ে বিক্রয় করা শরীআহের দৃষ্টিতে বৈধ। এদ্বারা প্রমাণিত হল, কিছু জিনিসের পৃথক মূল্য নেয়া না গেলেও পরোক্ষভাবে তার কারণে উক্ত জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে দিলে শরীআহর কোন আপত্তি থাকে না। এখানে আল-মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে বাকিতে পণ্য দেয়া হচ্ছে বলে মূল্য পরবর্তীতে উসুল করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এ কারণে অর্থাৎ সময়ের বিনিময়ে পণ্যের মূল্য বাড়েনি বরং যেহেতু এ লেনদেনে ক্রয়মূল্য ক্রেতাকে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয় সেজন্য অতিরিক্ত মূল্য পরে দেয়ার বিষয়টি উক্ত পণ্যের বিশেষ গুণ বিবেচনা করে মূল্য বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ এ পণ্যের মূল্য দেরীতে পরিশোধযোগ্য বিধায় 'দেরীতে পরিশোধযোগ্য' বিষয়টি পরোক্ষভাবে পণ্যের একটি গুণে পরিণত হয়েছে। সেজন্য এই পণ্য বিশেষ গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে পণ্যটিকে বেশি দামে বিক্রয় করা বৈধ বিবেচিত হচ্ছে, যা কোনভাবেও পরোক্ষভাবে সময় বাড়িয়ে মূল্য পরিশোধ করা যাবে মনে করে উক্ত সময়ের বিনিময়ে বাড়ানো হচ্ছে বলে ধারণা করার সুযোগ নেই। সুতরাং বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে বাজার দরের চেয়ে পণ্যের অতিরিক্ত যে মূল্যটুকু নেয়া হয়, তা সময় বাড়িয়ে পরিশোধ করার সুযোগ দেয়ার কারণেই নেয়া হয়, এই অভিযোগ তুলে যারা আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনকে অবৈধ বলে ধারণা করেন আসলে তাদের এ ধারণা সঠিক নয়।

সন্দেহ-৫

'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' আসলে যত না বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়, তার চেয়েও এটি অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থের আদান প্রদান, যাকে হালাল করার জন্য মাঝখানে কোন পণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে মাত্র। সুতরাং এখানে ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ অর্থাৎ সুদ আদায়ই মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং এ লেনদেন অবৈধ।

সন্দেহ নিরসন

সকল ক্রয় বিক্রয় নগদ হোক বা বাকিতে হোক নিরপেক্ষ বিচারে তো প্রত্যেকটিকে এভাবেই বিশেষণযুক্ত করা যেতে পারে যেমনটি এখানে করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের ভাষায় সেখানে যত না ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেন তা থেকে অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনই উদ্দেশ্য। যেমন তারা বলেন, একজন বিক্রেতা একশত টাকা মূল্যে কিছু ক্রয় করে তা একশত দশ টাকায় বিক্রয় করলে আসল কথা দাঁড়ায়, সে তা থেকে একশত টাকার বিনিময়ে একশত দশ টাকা গ্রহণ করেছে আর একে বৈধ

করার জন্য পণ্যটিকে এ লেনদেনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে মাত্র। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে বিশেষণে এরূপ উল্লেখ করার সুযোগ থাকলেও কিন্তু বিষয়টি এমন নয় যেমনটি তারা বুঝাতে চেয়েছেন। মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ লেনদেনকে হারাল করেছেন। এর কারণ হচ্ছে-

বিক্রেতা এখানে প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক তার শ্রম-মেধা-অর্থ পূর্ব থেকেই এ পণ্যের মধ্যে বিনিয়োগ করে রেখেছেন। এ পণ্য জমা করে রাখলে কালের আবর্তে গুণগত পরিবর্তনও হয়ে থাকে, যা অবশ্যই বিক্রেতার জন্য একটা ঝুঁকি। তার শ্রম, মেধা যা কিছু সে সেখানে খাটিয়েছে, তার বিনিময়ে সে অবশ্যই লাভে উক্ত পণ্য বিক্রয় করতে পারে। সেজন্য এ ক্রয়-বিক্রয়ে লভ্যাংশ বৈধ। পক্ষান্তরে টাকার বিনিময়ে টাকা বেশি নিলে সেখানে যেমন ঝুঁকিও থাকে না, তেমনি তার কোন কর্মকাণ্ড সেখানে ভূমিকা রাখে না, যার বিনিময়ে সে অতিরিক্ত কোন সুবিধা ক্রেতা থেকে পেতে পারে। সেজন্য অর্থের বিনিময়ে অর্থ বেশি নিলে তা হয় সুদ। সে কারণে এ ধরনের লেনদেনে অতিরিক্ত গ্রহণ করা অবৈধ। আলোচ্য আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে সাধারণত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই ঝুঁকি থাকে। বিক্রেতার শ্রম, মেধাও বিনিয়োগ হয়। যার বিপরীতে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ নেয়া বৈধ।

সন্দেহ-৬

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন দায়িত্বের বিপরীতে ঋণ বিক্রয়েরই নামান্তর, যা ইসলামে অবৈধ।

عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

> ইবন 'উমার হতে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ স. এক ঋণের বিনিময়ে অন্য ঋণকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"[৩১]

এই লেনদেনে বিক্রেতা পণ্যও দিচ্ছে না, ক্রেতা মূল্যও দিচ্ছে না। সুতরাং এটি ঋণের বিপরীতে ঋণ বিক্রয় ব্যতীত কিছুই নয়।

সন্দেহ নিরসন

আসলে তো এটি ওয়াদ বিল বা'ঈ। মূল ক্রয়-বিক্রয় নয়। ব্যাংক পণ্য হাতে পেলেই তো মূল ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন হবে। পণ্যও ক্রেতাকে বুঝে দেয়া হবে। সুতরাং এটা ঋণের বিপরীতে ঋণ বিক্রয় নয়। বিষয়টি তা থেকে ভিন্ন। সুতরাং 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' লেনদেনে ক্রয়-বিক্রয় নয়; আসলে অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ আদান প্রদানের অভিযোগে এই লেনদেনকে অবৈধ বলার কোন সুযোগ নেই।

---

৩১. আদ দারাকুতনী, *আস সুনান* (বৈরূত: ১৩৮৬ হি.), খ. ৩, পৃ. ৭১

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত যুক্তিতর্কের ও দলীলাদির ভিত্তিতে এই ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ প্রমাণিত হয়নি, সেজন্য এ ক্রয়-বিক্রয় সন্দেহাতীতভাবে বৈধ। এখানে ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারী এবং ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে পৃথক পৃথক যে দুটি ক্রয় বিক্রয় হয়েছে, তা ইসলামী ক্রয়-বিক্রয় নিয়মনীতির আলোকে এইজন্য বৈধ যে, এটি পারস্পরিক লেনদেনের বিষয় আর লেনদেন ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ কোন শরয়ী দলীলের দ্বারা তা হারাম বলে প্রতিপন্ন না হয়। যেমন বলা হয়েছে-

الأصل في عقود المعاملات الإباحة حتى يرد المنع منها.

"লেনদেনের চুক্তি অবৈধতার দলীল না পাওয়া পর্যন্ত তা বৈধ।"[৩২]

এখানে এটি হারাম হওয়ার তেমন কোন দলীল পাওয়া যায়নি; বরং নিম্নে উপস্থাপিত আয়াতসমূহ এ লেনদেনকে বৈধতা দেয়। আয়াতগুলো হচ্ছে-

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ .

"আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন।"[৩৩]

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।[৩৪]

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

"তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।"[৩৫]

সুতরাং আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন অবশ্যই বৈধ।

ইসলামী ব্যাংকসমূহে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ও শরীআহ

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হতে পেরেছি যে, আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতিতে ব্যবসা করা ইসলামী শারী'আয় সম্পূর্ণ বৈধ। তবে আমরা যেমনটি পূর্বেও বলেছি যে, যে কোন ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইসলামী শরীআহ বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে। আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতিও শরীআহ অনুযায়ী বৈধ হতে হলে বেশ কিছু বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কার্যকর করা প্রয়োজন। অন্যথায় এ ক্রয়-বিক্রয়ও সূদী লেনদেনে পরিণত হতে পারে। সেজন্য ব্যাংক, গ্রাহক ও সরবরাহকারী সকলেই, বিশেষ করে ব্যাংককে অতীব সতর্কতার সাথে

---

৩২. আবহাছু হায়'আতি কিবারুল 'উলামা, খ. ৫, পৃ. ১১২

৩৩. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

৩৪. আল-কুরআন, ৫ : ০১

৩৫. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

নিম্নের কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে প্রয়োজনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পরিপালনে বদ্ধ পরিকর হতে হবে। ভুললে চলবে না যে, ব্যাংকের সামান্য ক্রটিও এই লেনদেনকে সুদী লেনদেনে রূপান্তর করতে পারে। কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ-

১. গ্রাহকের পক্ষ থেকে ক্রয়ের অঙ্গীকারপত্র সম্পাদন

মূলত শরয়ী পরিভাষায় এ অঙ্গীকারনামাকে ওয়াদ বিশ শিরা বলা হয়। এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ গ্রহণের আবেদন করার পর অঙ্গীকার গ্রাহকের পক্ষ থেকে সম্পাদিত হয়। এ অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংককে উক্ত পণ্য ক্রয় করে দিতে হয়। তবে অধিকাংশ ফকীহর মতে, এই অঙ্গীকার ধর্মীয় ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যাংকের জন্য পালন বাধ্যতামূলক হলেও গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কেননা এটি বাধ্যতামূলক হলেই এ দু'পক্ষের বাধ্যতামূলক অঙ্গীকারের কারণে ক্রয় বিক্রয় পূর্ণভাবে সংঘটিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেহেতু পণ্য এখনো ব্যাংকের দখলে নেই, ক্রয়ও করা হয়নি, এরূপ পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক অঙ্গীকারের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। সেজন্য গ্রাহকের জন্য উক্ত অঙ্গীকার পালন বাধ্যতামূলক করলে ক্রয় বিক্রয় বৈধ হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সেজন্য ব্যাংককে বিষয়টি সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে, যাতে ব্যাংকও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার গ্রাহকের অঙ্গীকারও যাতে বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত না হয়। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহকের থেকে জামানত গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি তার কারণে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তা থেকে তা সমম্বয় করার উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য, উক্ত জামানতকে শরীআহর পরিভাষায় الضمان بالجدية (প্রবল ইচ্ছার জামানত) বলা হয়। উল্লেখ্য, ওয়াদ বিশ শিরা বা ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গিকারপত্র সম্পাদন করার সময় পণ্যের ধরণ প্রকৃতি ক্রয়মূল্যের পরে লভ্যাংশের হার প্রভৃতি স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যাতে ভুল বুঝাবুঝি ধোকা বা কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত না থাকে।

উল্লেখ্য, মূলত কোন কোন ফকীহ্ এ ক্ষেত্রেও সাধারণ ওয়াদার মত ওয়াদা পালনকে অপরিহার্য বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের প্রামাণ্য দলীলও তারা উপস্থাপন করেছেন। আমরা তাদের মতের সাথে সাধারণ ওয়াদা পালন যে অপরিহার্য সে বিষয়ে একমত। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ওয়াদা পালন যে হারাম সে বিষয়টিও আমাদের ভুললে চলবে না। যেমন কেউ যদি কোন হারাম কাজ করার ওয়াদা করে, তাহলেও কী তাকে সে ওয়াদা পালন অপরিহার্য হবে? কক্ষনো নয়। তাহলে সকল ক্ষেত্রে ওয়াদা পালন অপরিহার্য বিষয়টি তেমন নয়। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রটি ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত, যেখানে ওয়াদা পালন যে অপরিহার্য নয়, সে বিষযেরও দলীল রয়েছে।[৩৬] বিশেষ

---

৩৬. এ ক্ষেত্রে ওয়াদা পালন অপরিহার্য কী অপরীহার্য নয় সে বিষয়ে ফকীহদের মতামত ও উভয় পক্ষের দলীলসহ পর্যালোচনা দেখুনঃ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আররাষীন এর প্রবন্ধ 'হুকমুল ইলযামি বিলওয়াফায়ি বিলওয়াদ', http://almoslim.net/node/82806

করে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয়ে গ্রাহকের পক্ষ থেকে দেয়া পণ্য ক্রয়ের ওয়াদাটিকে মূলত ওয়াদা না বলে ক্রয়ের আগ্রহ বা ইচ্ছা প্রকাশ করা বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা এ ক্ষেত্রে ক্রয়ের ওয়াদাকে 'অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে' ধরে নিলে এ দ্বারা ক্রয় বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর এ অবস্থায় ক্রয় বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হওয়া শরীআহের কয়েকটি নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন-

* ক্রয় বিক্রয় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতেই বৈধ হয়। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণের সময় সম্মতি প্রদানের পথ আগের থেকেই রুদ্ধ হয়ে থাকে। বরং পণ্য গ্রহণ করতে ক্রেতা বাধ্য হয়, যা 'সম্মতি' এর সাথে সাংঘর্ষিক। সে জন্য এ যৌক্তিক কারণে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতার পক্ষ থেকে ওয়াদা পালনকে আধুনিক যুগের অধিকাংশ ফকীহগণ অপরিহার্য বলেন নি।

* ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ম নীতিতে 'খিয়ার' বা চুক্তি বলবৎ রাখা, না রাখার অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে ক্ষেত্রে ওয়াদা পালন অপরিহার্য হলে, এ অধিকার রহিত হয়। সে জন্য ওয়াদা পালন এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।

* ওয়াদা পালন এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য হলে এ দ্বারা ক্রয় বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হয়, যেহেতু এ সময় পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় নেই সে সময় যদি ক্রয় বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হয়, তাহলে ব্যাংক মালিক হয়নি এমন কিছুকে বিক্রয় করেছে বলে ধর্তব্য হবে, যা ইসলামী শরীআহ অবৈধ। সে জন্য ওয়াদা পালন এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য করা সঠিক নয়।

এ সঠিক বিষয় বিবেচনা করে ক্রয় বিক্রয়ে বিশেষ করে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরার ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ থেকে ওয়াদা পালনকে অপরিহার্য করা হয় নি। এর পক্ষে মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামীর একটি সিদ্ধান্ত[৩৭] ও ফাতাওয়া লাজনাতিদ দায়িমাতি লিলবুহুছিল ইসলামিয়াতি ওয়াল ইফতা বিভাগের একটি ফাতওয়া[৩৮] বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য।

২. সরবরাহকারী হতে পণ্য ক্রয়

'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' মূলত ভিন্ন ভিন্ন দুটি ক্রয় বিক্রয় বা লেনদেন। সরবরাহকারী হতে পণ্য ক্রয় এ লেনদেনের প্রথম লেনদেন। মূলত এটি

---

৩৭. *মাজাল্লাতু মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, ৫ম সংখ্যা, খ. ২, পৃ. ১৫৯৯

৩৮. *মাজাল্লাতু আল বুহূছিল ইসলামিয়্যাহ*, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ১১৪; উল্লেখ্য যে, যদিও কোনো কোনো আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ এরূপই মত প্রকাশ করেছেন; তবে আধুনিক একদল বিশেষজ্ঞ এরূপ মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে, ব্যাংক কারো শুধু আগ্রহ বা ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে কোনো পণ্য ক্রয় করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ব্যাংক বিরাট ঝুঁকির মধ্যে থাকবে। তাছাড়া বেচাকেনার অগ্রিম অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং চূড়ান্তভাবে ক্রয়বিক্রয় সম্পাদন করা এক কথা নয়। -নির্বাহী সম্পাদক।

সম্পন্ন হয় ব্যাংক ও সরবরাহকারীর মধ্যে, গ্রাহকের সাথে এ কেনার সম্পর্ক থাকে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজের দায় দায়িত্বে নিজের অর্থ দ্বারা সরবরাহকারীর নিকট থেকে ক্রয় বিক্রয়ের শরয়ী পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রথমত চুক্তি ও পরে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করে। ব্যাংকের পক্ষ থেকে পণ্যের মূল্য অবশ্যই সরবরাহকারী বা তার প্রতিনিধিকেই দিতে হবে। কেননা পণ্য যাদের নিকট থেকেই ক্রয় করা হয়েছে মূল্য তারাই পাবে। গ্রাহককে এই মূল্যের অর্থ দেয়া একেবারেই অবৈধ। এরপর উক্ত পণ্য অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকের মালিকানায় ও দখলে আসা অপরিহার্য। এ পণ্য গ্রাহককে না বুঝে দেয়া পর্যন্ত এর সমস্ত দায় দায়িত্ব ও ঝুঁকি ব্যাংককেই বহন করতে হবে। কেননা এ পণ্যের মালিকানা এখন ব্যাংকের; সেজন্য সরবরাহকারী অথবা গ্রাহক কেউই এর ঝুঁকি বহন করবে না। এ পর্যায়ে অন্যের উপর ঝুঁকি চাপিয়ে দেয়ার অর্থই হবে এর মালিকানা ব্যাংকের ছিল না আর ব্যাংক যার মালিক নয় তা তার জন্য বিক্রয়ও বৈধ নয়। সুতরাং এ পর্যায়ের সকল ঝুঁকি হবে ব্যাংকের জন্য। উল্লেখ্য, সুদী লেনদেনে কোন ঝুঁকি থাকে না বলেই তা অবৈধ। পক্ষান্তরে ক্রয় বিক্রয়ে এই ঝুঁকি রয়েছে বলেই তা বৈধ। পণ্য ক্রয়ের পর তার পরিবহনে যদি বীমা প্রক্রিয়া থাকে তাহলে তার খরচও ব্যাংককেই বহন করতে হবে। কেননা এ পণ্য এখন ব্যাংকের তাই এর আনুষঙ্গিক খরচও হবে তার। তবে পণ্য ক্রয় মূল্যের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে যুক্ত হয়েই তার উপর লভ্যাংশ নির্ধারণ করা যাবে।

গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন

ব্যাংক যেহেতু সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য ক্রয় করে দখল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেই তার মালিক হয়েছে এখন নিজের পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্যাংকের পক্ষ হতে গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে কোন দোষ নেই। উল্লেখ্য, এই পণ্যের মালিক হওয়ার পূর্বে যদি গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে তা বৈধ হবে না, তা হবে নিজের দখলে এমন পণ্য বিক্রয়েরই সামিল যা রাসূলুল্লাহ স. সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা হাদীসের দলীলাদি উল্লেখ করেছি। সুতরাং পণ্যটি দখলে নেয়ার পরেই ব্যাংক গ্রাহকের সাথে এই বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে, এর পূর্বে না। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহক থেকে ক্রয়ের অঙ্গীকারনামা নেয়ার সময়ই ঝামেলা এড়ানোর অজুহাতে এই বিক্রয় চুক্তিটিও সম্পন্ন করে ফেলেন এটি একেবারেই অবৈধ, যা ব্যাংকের পক্ষ থেকে হওয়া অবাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য, এ চুক্তিতে আনুষঙ্গিক খরচসহ ক্রয়মূল্য ও লভ্যাংশ স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে এবং কিস্তিতে বিক্রয় করলে পরিশোধের কিস্তি সময়কাল ও ধরনও সেখানে স্পষ্ট থাকতে হবে।

৩. গ্রাহককে পণ্য বুঝিয়ে দেয়া

এ পর্যায়ে ব্যাংকের দখলে আসা পণ্য ব্যাংক গ্রাহককে বুঝিয়ে দিবে।

৪. গ্রাহক পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে

সাধারণত এই মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়। যা শরীআহ বৈধ।

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্রাহক ওয়াকীল হওয়া

অনেক সময় 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' লেনদেনে গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রয়ের জন্য ওয়াকীল (প্রতিনিধি) বানানো হয়। ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে তিনি সরবরাহকারী হতে পণ্য ক্রয় করেন। যেহেতু এ কাজটি ছিল ব্যাংকের এবং উক্ত প্রতিনিধি ব্যাংকের নিটক থেকেই বিনিয়োগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে, সেহেতু পারিশ্রমিক ছাড়াই তার কাছ থেকে এই অতিরিক্ত কাজটি করানো কতটুকু শরীআহ সম্মত তাও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। তা থেকে যে শ্রমটুকু কোন বিনিময় ছাড়াই গ্রহণ করা হল, "كل قرض جر نفعا" প্রত্যেকটি ঋণ যা মূলধনের অতিরিক্ত কিছু নিয়ে আসে তা সুদ- এই মাপকাঠিতে এ বিষয়টি আদৌ বৈধ কিনা তা মূল্যায়নের প্রয়োজন। তবে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিয়ে দিলে সেটি অন্য কথা। কোন কোন ফকীহ বলে থাকেন ওয়াকীলকে তাই সে যেই হোক না কেন পারিশ্রমিক না দিলেও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন দোষের নয়। সেহেতু এখানে গ্রাহক ওয়াকীল বা প্রতিনিধি হলেও সেজন্য তার পারিশ্রমিক দেয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। আমরা মনে করি, সাধারণ প্রতিনিধি বা ওয়াকীল যদি পারিশ্রমিক না নিয়েই কোন কাজ করে মুওয়াক্কিলের (যিনি ওয়াকিল বানিয়েছেন) নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক না দেয়া হয় তাতে দোষের কিছু নেই এটা ঠিক আছে, তবে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে উক্ত ওয়াকীল আসলেই ব্যাংক থেকে বিনিয়োগের নামে ঋণ নিচ্ছে, সেজন্য ঋণী ব্যক্তির থেকে ঋণদাতা অতিরিক্ত কোন সুযোগ নেয়া বৈধ নয়, সেই আলোকে বিনা পারিশ্রমিকে তাকে প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংকের কাজ করানো উচিত নয় বলে আমরা মনে করি।

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে এমন কোন পণ্য, যা ব্যাংকের জন্য ক্রয় করে দেয়া একেবারেই অসম্ভব- শুধু এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ওয়াকীল বা ক্রয় প্রতিনিধির দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তবে তা অবশ্যই লিখিত আকারে হতে হবে এবং পণ্য ক্রয়ের অপারগতা যৌক্তিক হতে হবে। সেক্ষেত্রেও প্রতিনিধিকে পারিশ্রমিক দেয়া উচিত। তবে এই ক্রয় প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রাহককে দেয়ার মাধ্যমে যাতে প্রতিনিধি নিয়োগের দরজা এমনভাবে খুলে না যায় যে, যে কোন সামান্য অজুহাতে ব্যাংক নিজে ক্রয়-বিক্রয় না করে শুধু গ্রাহককেই ক্রয় প্রতিনিধি বানাবে, তাহলে তা শরীআহের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। 'আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা' লেনদেনে ব্যাংককেই পণ্য ক্রয়ের দায়িত্ব পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতিতে ব্যাংক লেনদেন করতে চাইলে

ব্যাংক হবে আসলে একজন ব্যবসায়ী। তাকে অবশ্যই ময়দানে একজন ব্যবসায়ী যেমন নিজেই পণ্য ক্রয় করে তা অন্যত্র বিক্রয় করেন তেমনি ব্যাংক কর্মকর্তাকে তা ক্রয় করতে হবে। ব্যাংকের কর্মকর্তাকে সশরীরে বাজারে গেয়ে পণ্য ক্রয় করে গ্রাহককে বুঝিয়ে দেয়ার মানসিক প্রস্তুতি ও তা বাস্তবায়নে আন্তরিক হয়েই ব্যাংক কর্মকর্তাকে এ ব্যাংকে চাকুরি নেয়া উচিত। তাকে মনে রাখতে হবে, তিনি যত না ব্যাংকার তার চেয়ে তিনি একজন ব্যবসায়ী।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি ব্যাংক গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে, তাহলে সরবরাহকারী হতে উক্ত ক্রয় প্রতিনিধি মাল ক্রয় করার পর ব্যাংককে তার কাছ থেকে তা বুঝে না নিলেও চলবে বলে দু একজন ফকীহ মত দিয়েছেন। তাদের মতে, ইজাব ও কবুল ছাড়াই বৈধ যে ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি রয়েছে, যাকে بيع التعاطي বলে, এটি সেই লেনদেনেরই অন্তর্ভুক্ত। আসলে ক্রয় বিক্রয় দুই প্রকার।

১. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের মৌখিকভাবে ইজাব ও কবুল প্রয়োজন হয় না। একজন মৌখিকভাবে হয় ইজাব না হয় কবুল উচ্চারণ করলেই অন্যজন চুপ থাকা অবস্থায়ও ক্রয় বিক্রয় বৈধ হয়ে যায়।

২. বিশেষ অবস্থায় মৌখিক ইজাব কবুল ছাড়া ও ক্রয় বিক্রয় সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন এক ব্যক্তি কোন দোকানে প্রবেশ করল। সেখানে সকল পণ্যের উপর মূল্য লেখা রয়েছে। তিনি কোন স্পষ্ট উচ্চারণ না করে তার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলো বিক্রেতার সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং লিখিত মূল্য পরিশোধ করে তা ক্রয় করে নিয়ে গেলেন। সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার ইজাব কবুলের কিছুই উচ্চারণ করলেন না। নিঃসন্দেহে এই দুই প্রকারের লেনদেন بيع التعاطي এর অন্তর্ভুক্ত, যা শরীআহ বৈধ। তবে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে সরবরাহকারীর নিকট থেকে সরাসরি ব্যাংকের কব্জা ব্যতীতই ক্রয় প্রতিনিধি পণ্য নিজে গ্রহণ করলে তা কয়েকটি কারণে بيع التعاطي বলে গণ্য হবে না:

১. بيع التعاطي ইজাব ও কবুলের সাথে সম্পর্কিত, যা মূলত এ ক্রয় বিক্রয়ে মৌখিক উচ্চারিত না হলেও বাস্তবতার আলোকে ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হয়েছে। একপক্ষ পণ্য নিয়ে নিল, অপর পক্ষ দিয়ে দিল, পণ্যের মূল্যও নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং এটি যে ইজাব কবুল তাতে সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরাতে ব্যাংক কব্জা না করতে পারার কারণে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ওয়াদ বিল বাঈ এর পরে মূল ক্রয় বিক্রয় সম্পন্নই হয়নি। بيع التعاطي তে উভয় পক্ষ উপস্থিত আর এখানে একপক্ষ অনুপস্থিত সুতরাং বা'ঈউত তা'আতি বলে গণ্য হবে না।

২. ব্যাংকের পক্ষ হতে এক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহককে বিক্রয় প্রতিনিধি করাও বৈধ হবে না। কেননা একই ব্যক্তি একই পণ্যের ক্রয় প্রতিনিধি ও বিক্রয় প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ ইসলামী শরীআহ একই লেনদেনে দেয়া হয়নি।

৩. পণ্য সরাসরি সরবরাহকারীর নিকট থেকে ব্যাংকের ক্রয় প্রতিনিধির হাতে পৌছানোর সাথে সাথেই بيع التعاطي হওয়ার সুযোগ এইজন্য নেই যে, এই পদ্ধতি সুদী পদ্ধতিরই নামান্তর। উক্ত মালে যেমন ব্যাংকের কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয়নি তেমনি তার ক্ষতির ঝুঁকিও তার উপর সামান্য সময়ের জন্য হলেও বর্তায়নি। সুতরাং এ ক্রয় বিক্রয় কখনো বৈধ নয়। তাহলে সুস্পষ্ট হলো যে, এ ক্রয়-বিক্রয়কে بيع التعاطي নাম দিয়ে বৈধ করার কোন সুযোগ নেই।

আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন বৈধ ও অবৈধ হওয়া

আসলে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন কোন্ কোন্ কাজের দ্বারা বৈধ লেনদেন বলে গণ্য হয় আর কোন্ কোন্ কাজের দ্বারা অবৈধ বলে বিবেচিত হয় নিম্নের ছকে তা উল্লেখ করা হলো-

বৈধ	অবৈধ
১. গ্রাহকের জন্য আলওয়াদ বিশশিরা এর অঙ্গীকারকে বাধ্যতামূলক না করা	গ্রাহকের জন্য আলওয়াদ বিশ শিরাকে বাধ্যতামূলক করা[৩৯]
২. সরবরাহকারী হতে পণ্য ব্যাংক বুঝে নিয়ে দখলে এনে তারপর তা গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা	পণ্য না বুঝেই দখল ছাড়াই গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করা
৩. গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তি সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য দখলে নেয়ার পরে করা	গ্রাহকের সাথে বিক্রয় চুক্তি সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য দখলে নেয়ার পূর্বে সম্পন্ন করা
৪. পণ্যের মূল্যের অর্থ কোনভাবেই গ্রাহককে না দেয়া	পণ্যের মূল্যের অর্থ গ্রাহক বা তার প্রতিনিধিকে দিলে তাই তা ক্যাশ থেকে হোক বা তার একাউন্টে হোক, এ সময় এ অর্থ পণ্যের মূল্য বাবদ খরচ না হয়ে অন্য কিছুতে খরচ হতে পারে
৫. বিশুদ্ধ ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করে পণ্যের মূল্য সরবরাহকারীকে দিলে	সরবরাহকারীর নিকট গ্রাহক পূর্ব থেকে ঋণী থাকলে নামমাত্র ক্রয় বিক্রয় দেখিয়ে সে টাকা সরবরাহকারীকে দিয়ে দিলে তা দিয়ে গ্রাহক ঋণ শোধ করলে

[৩৯] এ বিষয়ে আধুনিক ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞের মতে, ক্রয়ের অঙ্গীকার প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক। - নির্বাহী সম্পাদক।

৬. চাহিদামত গ্রাহক পণ্য নিজের কাজে ব্যবহার করলে	গ্রাহককে পণ্য বুঝে দেয়ার পর গ্রাহক উক্ত পণ্য ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে পুনরায় সরবরাহকারীর নিকট বিক্রয় করলে
৭. ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের ভিতরে অবশ্যই পণ্যের আদান প্রদান হতে হবে। প্রত্যেকের নিকট থেকে ব্যাংক পণ্য দখলে নিয়ে অপরকে বুঝে দিতে হবে	সরবরাহকারী পূর্ব থেকেই মুরাবাহা এর জন্য গ্রাহককে বিল/ভাউচার প্রদান করে একইভাবে গ্রাহক ও সরবরাহকারীকে বিল/ভাউচার প্রদান করে। এক্ষেত্রে গ্রাহক হয় সরবরাহকারী আর উভয়ই ব্যাংকে এসে আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে অংশ নেয়। সেক্ষেত্রে পণ্যের আদান প্রদান হয় না শুধু অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থই লেনদেন হয়।
৮. গ্রাহককে প্রতিনিধি না বানিয়ে তাকে পণ্যের মূল্য প্রদান করলে	ব্যাংক সরবরাহকারী হতে পণ্য ক্রয়ের জন্য অপারগ হলে শরীআহ কাউন্সিলের অনুমতিক্রমে লিখিতভাবে গ্রাহককে ওকীল বা প্রতিনিধি না বানিয়ে তাকে পণ্যের মূল্য প্রদান করলে
৯. ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় প্রতিনিধি থেকে পণ্য দখলে নিলে	গ্রাহক ব্যাংকের ক্রয় প্রতিনিধি হয়ে টাকা ব্যাংক থেকে গ্রহণ করে পণ্য ক্রয় করার পর তা ব্যাংক দখলে না নিয়েগ্রাহকের নিকট পুনরায় বিক্রয় করলে
১০. ক্রয় প্রতিনিধি ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে তা দিয়ে নির্ধারিত মাল ক্রয় করলে এবং ব্যাংক তা দখলে নিয়ে তাকে বুঝে দিলে	ক্রয় প্রতিনিধি ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে তা দিয়ে নির্ধারিত মাল ক্রয় না করলে
১১. পূর্বের দায় ভিন্ন কোন ফান্ড থেকে পরিশোধ করে পরবর্তীতে পুনরায় আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেনে অংশগ্রহণ করা	নতুন আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা লেনদেন চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পূর্বের দায় শোধ করা
১২. পূর্বের দেনা পরিশোধের জন্য কোন বিনিময় ছাড়াই সময় বাড়িয়ে দেয়া	পূর্বের দেনা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক সময় বাড়িয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা
১৩. সহযোগিতার মাধ্যমে শরীআহ লংঘন না করেই Overdue পরিশোধের জন্য গ্রাহককে সুযোগ করে দেয়া	ব্যাংক Overdue নামক অভিশাপ থেকে গ্রাহককে বাঁচানো ও ব্যাংক বাঁচার জন্য পুরাতন দায়কে নতুন দায়ে সমন্বয় করা
১৪. যত টাকা অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং যে পণ্য ক্রয়ের জন্য তা অনুমোদন নেয়া হয়ে সেই অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করা	অনুমোদিত টাকার চেয়ে কম টাকার পণ্য ক্রয় অথবা অনুমোদিত পণ্য ব্যতীত অন্য কোন পণ্য ক্রয় করা

১৫. পণ্য সরবরাহকারী থেকে বুঝে নেয়ার পরে গ্রাহককে বুঝে দেয়ার পূর্বে যদি ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহলে তা ব্যাংককেই বহন করা	এ অবস্থায় ব্যাংক ক্ষয় ক্ষতির দায় বহন না করা
১৬. গ্রাহকের জামানত লোকসান যদি না হয় পরিপূর্ণটা আর লোকসান হলে সমন্বয় করার পরে অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহককে ফিরিয়ে দেয়া	গ্রাহকের জামানত ফিরিয়ে না দেয়া
১৭. মাল ক্রয়ের পূর্বে তার মূল্য বাবদ অর্থ ব্যাংক থেকে ক্রয় প্রতিনিধিকে দেয়া	পূর্বে গ্রাহক মাল ক্রয় করে পরে ব্যাংক থেকে এর মূল্য বাবদ অর্থ নিয়ে নেয়া। (এমনকি এ পরিস্থিতিতে পণ্য সরবরাহকারীকেও উক্ত টাকা দিলে তাও এটি অবৈধই থাকবে)
১৮. প্রকৃত ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হলে	শুধুমাত্র ক্যাশ মেমো সরবরাহ করা ও কাগুজে ক্রয় বিক্রয় হওয়া এবং প্রকৃত ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন না হওয়া
১৯. ব্যাংক কর্তৃক মাল ক্রয় করলে	ক্রয় প্রতিনিধি ও ব্যাংক ব্যতীত অন্য কেউ পণ্য ক্রয় করলে
২০. সরবরাহকারীর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা	সরবরাহকারীর অস্তিত্ব না পাওয়া
২১. ডিসবার্সমেন্টের পরে ক্যাশ মেমো ইস্যু হওয়া	ডিসবার্সমেন্টের পূর্বে ক্যাশ মেমো ইস্যু হওয়া
২২. ডিসবার্সমেন্টের পরিমাণের সাথে ক্যাশ মেমোর পরিমাণ মিল থাকা	ডিসবার্সমেন্টের পরিমাণের সাথে ক্যাশ মেমোর পরিমাণ মিল না থাকা

এখানে অবৈধতার সমস্যা উত্তরণের সর্বোত্তম পন্থাসমূহ হচ্ছে-

১. বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গ্রাহক ও সরবরাহকারীদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করা;

২. শরীআহর প্রশিক্ষণকে আরো জোরদার করা;

৩. আলমুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা একটি ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি, যা সম্পাদনের জন্য ব্যবসায়ীর প্রয়োজন। সেজন্য ব্যাংকের জনশক্তিকে ব্যবসায়ীগণ যেসব কার্য সম্পাদন করেন তা সম্পাদনকে মেনে নিয়ে কার্যক্রমে অংশ নেয়া;

৪. এ পদ্ধতি শরীআহ অনুযায়ী সম্পাদিত না হলে লেনদেন সুদী লেনদেনে রূপান্তরিত হয় সেজন্য সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া;

৫. শরীআহ পরিপালনকে জটিল মনে করে তা পরিপালনে শৈথিল্য প্রদর্শন না করা;
৬. এক্ষেত্রে উর্ধ্বতনদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বন্ধ হওয়া;
৭. বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বেই গ্রাহককে শরয়ী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান;
৮. শরীআহ লংঘনকারী কর্মকর্তাকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা;
৯. শরীআহ মুরাকিবগণকে তাদের পদোন্নতি, জবাবদিহি প্রভৃতির জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে শরীআহ সুপারভাইজরি কাউন্সিলের নিকট নির্ভরশীল করা;
১০. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও পরিচালনা পর্ষদ শুধু ব্যবসার স্বার্থে ব্যাংককে ইসলামীকরণ না করে সত্যিকার অর্থে আন্তরিকতার সাথে ব্যাংকের প্রতিটি কাজে শরীআহ পরিপালনের ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর হওয়া এবং শরীআহ পরিপালন ও বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া।

উপসংহার

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, আল মুরাবাহাতু লিল আমিরি বিশশিরা যদি সঠিকভাবে শরীআহ পরিপালন করে অনুশীলন করা যায়, তাহলে এ পদ্ধতি হালাল ও এ পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশও হালাল। তবে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যাংকসমূহকে খুব সতর্কতার সাথে এ পদ্ধতিকে অনুশীলন করা অপরিহার্য। সামান্য অবহেলা, অসতর্কতা ও গাফলতির কারণে এ পদ্ধতি অনুশীলনে শরীআহ লংঘন হলে, এ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সুদে পরিণত হবে তাতে সন্দেহ নেই, যার অনিবার্য পরিণতিতে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যাংকসমূহে সুদের সংমিশ্রন ঘটবে, যা মোটেও কাম্য নয়।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন : ২০১৬

ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

মো: মিজানুর রহমান*

Inheritance of Women in Religious Succession Law: A Comparative Study

ABSTRACT

Women's right is one of the most talked-about issues of today. Inheritance is the most important component of women's rights. Different civilizations and religions consider women from different viewpoints and perspectives. Some civilizations denied their rights completely, while some others recognized their dignity and rights. Against this backdrop, this article has been prepared to conduct a comparative study to analyze the status between different religious laws pertaining to provisions for inheritance of women. As scope of the study the religions of Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity and Islam have been selected for comparison. Descriptive, analytical and comparative methods have been adopted in preparing the article. The study has been able to prove that different civilizations of the world have deprived women from their rights especially from right of inheritance, while it is only Islam which has provided true dignity and right of inheritance to them.

Keywords: inheritance of women; religion; inheritance law; Islam and women.

সারসংক্ষেপ

নারী-অধিকার বর্তমান সময়ের আলোচিত একটি বিষয়। নারী অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তার সম্পদের উত্তরাধিকার। বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্ম নারীকে ভিন্ন ভিন্ন

* ম্যানেজার অপারেশনস ও এসিষ্টান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, বংশাল শাখা, ঢাকা।

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। কোন কোন সভ্যতায় নারীকে তার সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আবার কোন কোন সভ্যতায় তার মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ সার্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধর্মে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনে নারীর প্রাপ্য অংশ বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। গবেষণার পরিধি হিসেবে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মকে বেছে নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় বিশেষত সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার-বঞ্চিত করা হয়েছে। একমাত্র ইসলামই নারীকে তার যথার্থ মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেছে।

মূলশব্দ: নারীর উত্তরাধিকার; ধর্ম; উত্তরাধিকার আইন; ইসলাম ও নারী।

ভূমিকা

উত্তরাধিকার আইন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তানো যাবতীয় বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করে। উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো একেবারেই পারিবারিক বলে পারিবারিক আইন অনুযায়ীই এগুলো পরিচালিত হয়। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের, এমনকি উপজাতীয়দেরও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান আছে। এসব আইনে নারীর অংশ বিষয়েও আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা 'নারী অধিকার' নিয়ে সারা পৃথিবী আজ সরব। সভা-সমিতি ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামসহ বিভিন্ন লেখায় 'নারী অধিকার' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকারের ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সমালোচিত হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মে নারী অধিকারের পরিধির বিষয়টিও। অনেকে অজ্ঞতা ও প্রতিহিংসাবশত ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাদের অভিযোগগুলোর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করার জন্য অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান আলোচনা প্রয়োজন। উক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অত্র প্রবন্ধে ইসলামের পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী ও খ্রিস্ট ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার অংশ নিয়ে আলোচনা করে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

জাহিলি যুগে নারীর আর্থিক অধিকার

জাহিলি যুগে ইয়াতীম মেয়ে ও বিধবাদের অবস্থা খুবই করুণ ও মারাত্মক ছিল। অভিভাবকরা তাদের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করতো। ইয়াতীম মেয়েদের ভাল সম্পদকে খারাপ সম্পদের সাথে বদল করে নিত এ ভয়ে যে, বড় হয়ে তারা তাদের সম্পদ ফিরিয়ে নেবে। উপরন্তু, ধন-সম্পদের লোভে অভিভাবকরা ছোট ছোট

ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করার মানসে তাদের ঘরে আটকে রাখতো। কোন আন্ত রিকতার বশবর্তী হয়ে নয়; বরং ইয়াতীম মেয়েদের সম্পদ কুক্ষিগত করার হীন মানসিকতার উদ্দেশ্যেই তা করা হতো। মহিলাদেরকে মীরাসের অংশ দেয়া হতো না। বরং শক্তিশালী ছেলে ওয়ারিস হতো, যে খুব বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারতো। যুদ্ধক্ষেত্রে যে অশ্ব ও অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী, তাকেই মীরাসের সিংহভাগ দেয়া হতো। দুর্বল-অসহায় ও মেয়ে ওয়ারিসকে বঞ্চিত করা হতো।

কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তার অভিভাবক কাছে এসে তার ওপর তার কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং সে এটা ভাল করেই জানতো যে, এ মহিলা নিশ্চিতভাবে তারই জন্য গচ্ছিতা ও রক্ষিতা হয়ে গেলো, সে ইচ্ছা করলে তাকে মোহর ছাড়াই বিয়ে করতে পারতো অথবা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে তার মোহর সে কুক্ষিগত করতে পারতো। কিংবা স্বামী তাকে তালাক দেয়ার পর তাকে অন্যত্র বিয়ে বসা থেকে বলপূর্বক বিরত রেখে তাকে এমন অবস্থায় রাখতো, যেখানে তাকে স্ত্রী বুঝা যেতো না, আবার তালাকপ্রাপ্তাও বুঝা যেতো না। টাকা দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত কথিত স্বামী তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখতো। সম্পদের লোভে স্বীয় ইচ্ছামতো যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করতো আবার যে কোন মুহূর্তে তালাক দিয়ে দিতো। এভাবে নারী জাতির মর্যাদার অধঃপতনের কারণে জাহিলিয়াতের পারিবারিক বন্ধনও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। এ হলো জাহিলিয়াতের নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের খণ্ড চিত্র। আর এ জগদ্দল পাথর মানুষের মন ও মানসে এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, ইসলাম আসার পরও তাদের বিশ্বাসে এ প্রশ্ন থেকেই গিয়েছিল যে, মেয়েরাও কি মীরাস পেতে পারে? যেমন আল্লাহ যখন ঘোষণা করলেন:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।"[১]

তখন অনেকে তার প্রতিবাদ করেন। 'আল আউফি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহর নবী এই আয়াতের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ, নারী ও পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করেন, তখন কেউ কেউ তা অপছন্দ করেন এবং বলেন, নারীকে চারের এক অথবা আটের এক, মেয়েকে দুয়ের এক, এমনিভাবে ছোট শিশুকেও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ দেয়া হচ্ছে, অথচ তাদের কেউ জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না। তারা কিভাবে সম্পত্তির অংশ পেতে পারে? অতএব, তোমরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টন সম্পর্কে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকো, কোন

১. আল কুরআন, ৪ : ১১

কথা বলো না, সম্ভবত রাসূল স. তা ভুলে যাবেন অথবা আমরা তাঁকে তা পরিবর্তন করার জন্য বলব। অতপর তারা রসূলের স. কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পিতার মৃত্যুর পর মেয়ে যদি একজন হয় তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দেয়া হয় অথচ সে অশ্বারোহণ করে যুদ্ধের মাঠে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না। একইভাবে শিশুকেও মীরাস দেয়া হয়, যে কোন কাজেই আসে না। ইবনে আবী হাতীম ও ইবনে জারীর উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।'[২]

হিন্দু ধর্মে নারীর ওয়ারিসী স্বত্ব

হিন্দু আইনের প্রধান উৎস হলো বেদ, স্মৃতি ও প্রথা। প্রথা অর্থাৎ যে সকল রীতিনীতি হিন্দু পরিবার অথবা কোন অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত ছিল, সেগুলো হিন্দু আইনে পরিণত হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুটি আইন চালু রয়েছে। যথা-১) মিতাক্ষরা পদ্ধতি ২) দায়ভাগ পদ্ধতি।

মিতাক্ষরা পদ্ধতি

হিন্দু ওয়ারিসী স্বত্ব আইন বিষয়ক একটি গ্রন্থের নাম মিতাক্ষরা। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক এটি রচিত। এ আইন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। এ আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পারিবারিক সম্পত্তিতে উত্তরজীবী সূত্রে অংশীদার হয়। তাই এ আইনে পিতা,পুত্র ও পৌত্র একই সংগে উত্তরাধিকারী হতে পারে। মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রক্তের নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। এ আইনে তিন শ্রেণির উত্তরাধিকারী রয়েছে। যথা-১) গোত্রজ সপিণ্ড, ২) সমানোদক ও ৩) বন্ধু।

---

২. সাইয়েদ কতুব শহীদ, *তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন*, অনুবাদঃ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ (লন্ডনঃ আল কুরআন একাডেমী, ২০০১) খ. ৪, পৃ. ৫৯

عن ابن عباس قوله: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والانثى والابوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: نعطي المراة الربع والثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينساه أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول الله، انعطي الجارية نصف ما ترك ابوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث، وليس يعني شيئا

ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর* (ছৈয়দাঃ দারুল মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৮৮২; ইবনু জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ানি ফী তা'বীলিল কুরআন* (বৈরূতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০), খ. ৭, পৃ. ৩২

গোত্রজ সপিণ্ডের উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা মোট ৫৭ জন। সংক্ষিপ্তভাবে তাদের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

ক্রম	ওয়ারিস	সংখ্যা
১	পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি অধঃস্তন পুরুষ	৬
২	পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি উর্ধতন পুরুষ	৬
৩	উপরোক্ত উর্ধতন পুরুষের পত্নীগণ	৬
৪	উপরোক্ত ৬টি উর্ধতন পুরুষের প্রত্যেকের পুরুষ বংশধারায় ৬টি অধঃস্তন পুরুষ (৬×৬)	৩৬
৫	বিধবা স্ত্রী, কন্যা ও কন্যার পুত্র	৩
	মোট	৫৭

সারণি-১ঃ মিতাক্ষরা আইনে সপিণ্ডের তালিকা

উল্লেখ্য, গোত্রজ সপিণ্ডের কেউ জীবিত না থাকলে সমানোদক ও বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে। আবার সমানোদক শ্রেণির কেউ বেঁচে না থাকলে বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে। প্রথম শ্রেণির কেউ না কেউ বেঁচে থাকতে পারে, তাই ২য় ও ৩য় শ্রেণির উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্ভবনা খুবই ক্ষীণ।

দায়ভাগ পদ্ধতি

মিতাক্ষরার মতই দায়ভাগ একটি হিন্দু ওয়ারিসী স্বত্ব আইন বিষয়ক গ্রন্থের নাম। এটি জীমূতবাহন কর্তৃক রচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর প্রদেশের হিন্দু সমাজে এ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকারী হবার জন্যে পিণ্ডদান শর্ত।

যারা পিণ্ডদান করে তাদেরকে সপিণ্ড বলে। মৃত ব্যক্তির পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের উর্ধ্বতন এবং নিম্নতম তিন পুরুষদেরকে বলা হয় সপিণ্ড। দায়ভাগ আইন অনুয়ায়ী তিন শ্রেণির লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যথা- ১) সপিণ্ড, ২) সাকুল্য ও ৩) সমানোদক।

পিণ্ড

হিন্দু মৃত ব্যক্তির আত্মার স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে তার সপিণ্ডরা আতপ চাল, পাকা কলা, গরুর কাঁচা দুধ, গঙ্গাজল, ঘি, মধু, তিল, গুড়, কর্পূর ইত্যাদি একটি পিতলের পাত্রে বা মালসায় মেখে যে মিশ্রণ তৈরি করে সেটাই পিণ্ড। এবং সেটি গঙ্গাজলে অথবা অন্যকোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হয়। সপিণ্ড মোট ৫৩ জন, এরা প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারী। সপিণ্ডের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রম	ওয়ারিস	সংখ্যা
১	পুত্রের পক্ষ হতে অধঃস্তন তিন পুরুষ যথা-পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং কন্যার তরফ হতে অধঃস্তন তিন পুরুষ যথা-কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র	৬
২	পিতার তরফ হতে উর্ধতন তিন পুরুষ এবং মাতার তরফের তিন পুরুষ	৬
৩	ভ্রাতা, ভ্রাতার পুত্র, ভ্রাতার পুত্রের পুত্র, এভাবে খুড়ার তিন পুরুষ, পিতার খুড়ার তিন পুরুষ, ভগ্নির পুত্রের তিন পুরুষ, ভ্রাতার কন্যার পুত্র ও তিন পুরুষ, পিতার কুড়ার কন্যার খুড়া ও তিন পুরুষ, মামা ও তার তিন পুরুষ, মাতার খুড়া ও তার তিন পুরুষ, মামার কন্যার পুত্র, মামার পুত্রের পুত্র	৩৬
৪	বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা এবং পিতার মাতার মাতা	৫
	মোট	৫৩

সারণি-২: দায়ভাগ আইনে সপিণ্ডের তালিকা

সপিণ্ডের উপরোক্ত কেউ জীবিত থাকলে সাকুল্য ও সমানোদক শ্রেণির কেউ উত্তরাধিকারী হবে না ।[৩]

মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ আইনে হিন্দু নারীর ওয়ারিসী স্বত্ব

- দায়ভাগ আইনে সপিণ্ডের মধ্যে মহিলার সংখ্যা মাত্র পাঁচজন। এরা আবার দুই প্রকার। পিতৃকুলের সপিণ্ড এবং মাতৃকুলের সপিণ্ড। পিতৃকুলের সপিণ্ড বর্তমান থাকলে মাতৃকুলের সপিণ্ডরা স্বত্ব পায় না। দায়ভাগ আইন উত্তরজীবী সূত্র স্বীকার করে না। মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডদের প্রথম ৪ স্তরের অর্থাৎ পুত্র বা পুত্রের বিধবা স্ত্রী, পৌত্র বা পৌত্রের বিধবা স্ত্রী, প্রপৌত্র বা প্রৌত্রের বিধবা স্ত্রী এবং মৃতের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান উত্তরাধিকারী হবে না। পেলেও, তাতে জীবনস্বত্বের[৪] শর্ত প্রযোজ্য।

- মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা জীবিত থাকলে কন্যা মৃত পিতার সম্পত্তি হতে অংশ পায় না। এ আইনের আওতায় নারীর না পাবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে, কারণ উল্লেখিত ব্যক্তিদের কেউ না কেউ বেঁচে থাকে।

---

৩. এলিনা জুবাইদি বেবী, কাজী নজরুল ইসলাম ও সাধন কুমার নন্দী, *দৈনন্দিন জীবনে আইন* (ঢাকা: ব্র্যাক মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচী ১ম প্রকাশ ১লা এপ্রিল, ২০০৩), পৃ. ৪০-৪৩

৪. জীবনস্বত্ব বলতে বুঝায়, যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন সম্পত্তি শুধুমাত্র ভোগ করে যাবে। সম্পত্তি দান, বিক্রি বা উইল করতে পারবে না। অর্থাৎ মালিকানার পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ ঐ সম্পত্তির ওপর তার পূর্ণ অধিকার থাকে না। এ সম্পত্তিতে সীমিত অধিকার জন্মায়।

- জীবনস্বত্ব কেড়ে নেয়া হয় যদি অবিবাহিত কন্যা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তদ্রুপ বিধবা যদি অন্যত্র বিবাহ করে তারও ভোগস্বত্ব বাতিল হয়। জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের কাছে চলে যাবে।
- তবে বাস্তবতা এই যে, কন্যাসহ অন্য চারজন মহিলাকে সপিণ্ডদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, এমন অবস্থানে রাখা হয়েছে যে, তাদের অংশ পাবার তেমন সম্ভাবনা নেই। পেলেও তাতে আবার জীবনস্বত্বের শর্ত প্রযোজ্য।
- দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিসগণ জীবিত থাকলে কন্যাগণ কোন অংশ পাবে না। অন্যান্য ওয়ারিসগণের অবর্তমানে কন্যাগণ উত্তরাধিকারী হলেও, যে সকল কন্যা বন্ধ্যা কিংবা শুধুমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা মৃত পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে না।
- সপিণ্ড প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারী। ৫৩ জন সপিণ্ডের মধ্যে ৫ জন মহিলাকে শর্ত ভিত্তিক সপিণ্ডের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কারণ এ ৫জন মহিলার পুত্র আছে অথবা পুত্র হওয়ার সম্ভবনা আছে। সেই পুত্র মৃত ব্যক্তির আত্মার স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিতে পারে। তাই এ ৫ জন মহিলাকে সপিণ্ড বলা হয়।
- মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রীগণের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কন্যা সন্তান তার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না।
- মিতাক্ষরা আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। ফলে পিতার জীবিতাবস্থায়ই পুত্র তার অংশ দাবি করতে পারে। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলেই উত্তরাধিকারী হতে পারে না।
- মিতাক্ষরা আইনে ৫৭ জন সপিণ্ডের মধ্যে মাত্র ৫ জন হল মহিলা, আর বাকী ৫২ জনই হল পুরুষ। দায়ভাগ আইনেও ৫৩ জন সপিণ্ডের মধ্যে ৫ জন হল মহিলা। আর এ ৫ জন নারীকে সপিণ্ডের এমন অবস্থানে রাখা হয়েছে যে, তাদের মীরাস পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। স্ত্রী সপিণ্ডের চার নম্বর তালিকায়, মেয়ে পাঁচ নম্বর তালিকায়, মা আট নম্বর তালিকায়, দাদি চৌদ্দ নম্বর তালিকায় এবং প্রপিতামহী অর্থাৎ পিতার পিতার মা বিশ নম্বর তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
- উল্লেখিত ৫ জন সপিণ্ড মহিলা শুধুমাত্র জীবনস্বত্বে সম্পত্তি পায়। অর্থাৎ যতদিন সে বেঁচে থাকবে শুধুমাত্র তা ভোগ ব্যবহার করতে পারবে। তা বিক্রি, দান বা হেবা কোন কিছুই করতে পারবে না। কুমারী কন্যার যদি বিবাহ হয় তবে জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার হারাবে, অনুরূপভাবে বিধবা স্ত্রী যদি পুর্নবিবাহ করে, তবে জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না।

- কোন মহিলা যদি তার মৃত কোন মহিলা বা পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি পায়, তবে তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি যার নিকট থেকে পেয়েছিল তার কাছে ফেরত যাবে।
- পূর্বে হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র জীবিত থাকলে বিধবা কোন অংশ পেত না। ১৯৩৭ সালে সম্পত্তির উপর বিধবা স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত (১৯৩৭ সালের ১৮ নং আইন) পাশ হবার পর মৃতের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রের সাথে অংশ পায়। উক্ত আইনটি ১৪-০৪-১৯৩৭ হতে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু কৃষি জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।
- শারীরিক ও মানসিকভাবে অযোগ্য ব্যক্তি, যেমন অন্ধ, খঞ্জ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, কুষ্ঠ বা অন্য কোন দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, পাগল ইত্যাদি হিন্দু মীরাসী আইনে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাবে না।[৫]

বৌদ্ধ আইনে নারীর উত্তরাধিকার

বৌদ্ধদের আলাদা কোন উত্তরাধিকার আইন না থাকলেও হিন্দুদের দায়ভাগ আইন তাদের মধ্যে প্রচলিত। বাংলাদেশের বৌদ্ধগণও উত্তরাধিকার বিধানের ক্ষেত্রে হিন্দু দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। মিয়ানমারের বৌদ্ধ Burman Buddhist নামে পরিচিত। তারা স্থানীয় উত্তরাধিকার আইনে শাসিত। তাদের উত্তরাধিকারীগণের ক্রম নিম্নরূপ:

১. পুত্র
২. পৌত্র
৩. প্রপৌত্র
৪. দত্তক পুত্র
৫. সৎ মাতার পুত্র
৬. অবৈধ সন্তান ও অবৈধ সৎপত্নীর সন্তান
৭. ভ্রাতা ও ভগ্নি
৮. পিতামাতা
৯. পিতার পিতামাতা
১০. দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ((ক) ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রী, (খ) খুড়া ও খুড়ি, (গ) ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীর সন্তানগণ, (ঘ) কাজিন, (ঙ) ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীর পৌত্র

---

৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব: বেবী ও অন্যান্য, *দৈনন্দিন জীবনে আইন*, পৃ. ৪২-৫৫; হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫, ১৯৫৬ ও ২০০৫ (সংশোধনী)।

ও পৌত্রীগণ, (চ) কাজিনের সন্তানগণ, (ছ) কাজিনের পৌত্র সন্তানগণ ও (জ) কাজিনের প্রপৌত্র সন্তানগণ।[৬]

মিয়ানমারের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীগণের যে তালিকা আমরা দেখতে পেলাম, তাতে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অধিকার রয়েছে। পুত্র থেকে শুরু করে কাজিনের প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রায় সবাই পুরুষ। দীর্ঘ তালিকায় প্রপৌত্র, সৎ মাতার পুত্র এমনকি কাজিনের প্রপৌত্র স্থান পেল, অথচ মৃতের স্ত্রী, কন্যা ও পৌত্রীর নাম উল্লেখ নেই। তবে সম্প্রতি এসব আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে। যেমন ছেলে ও মেয়ে উভয়ে ওয়ারিস হতে পারবে। একইভাবে স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অংশ নির্ধারণসহ বিভিন্ন ওয়ারিসী স্বত্বে নারী-পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।[৭]

ইয়াহুদী আইনে নারীর উত্তরাধিকার

এ ধর্মের আইনে উত্তরাধিকারে কন্যা, মা, বোন বা অন্য কোন হিসেবে থেকে নারীর কোন অংশ নেই, যদি মৃতের পুত্র, পিতা, ভাই, চাচা বা সমজাতীয় নিকটতম কেউ বেঁচে থাকে। অতএব, এ ধর্মে উত্তরাধিকারের হকদার হওয়ার জন্য পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও চাচার সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। পুত্র সন্তান থাকলে পিতার মৃত্যুর পর শুধুমাত্র সেই উত্তরাধিকার পাবেন এবং অন্য সব আত্মীয় বঞ্চিত হবেন। বিবাহিত পুত্র অবিবাহিত পুত্রের দ্বিগুণ পাবেন। তবে এ আইনে মৃতের পুত্র বা পৌত্র না থাকলে কন্যা ত্যাজ্য সম্পদের অধিকারী হয়। কুমারী ও অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ হওয়া পর্যন্ত পিতার ত্যাজ্যসম্পত্তিতে লালিতপালিত হওয়ার অধিকার রাখে। বিবাহিতা কন্যাগণ ভাইদের কাছে পিতার ত্যাজ্যসম্পত্তি থেকে নিজ মোহরের অর্থ ফেরত চাইতে পারেন। স্ত্রী তার স্বামীর ওয়ারিসী স্বত্বের অধিকারী হতে পারবেন না। যদি বিবাহের সময় স্ত্রী উত্তরাধিকার পাবেন মর্মে শর্তারোপ করা হয়, তবে পুত্র বা অন্য ওয়ারিস থাকলে উক্ত শর্ত বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। তবে স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে বিধবা স্ত্রী জীবনধারণের ব্যয়নির্বাহ বা জীবনস্বত্ব ভোগ করতে পারবেন। পক্ষান্তরে স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোন অংশিদারিত্ব ছাড়াই এককভাবে স্বামী

---

৬. ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার* (ঢাকা: আই. আর .এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫), পৃ. ১৩৯-১৪০

৭. Yee Yee Cho, "Women's Rights under Myanmar Customary Law", *Dagon University Research Journal*, Vol. 4, 2012, pp 57-66; *The Myanmar Buddhist Women's Special Marriage Law (draft)*: A. E. Rigg, "The Buddhist Law of Succession in Burma", *Journal of Comparative Legislation and International Law*, Published by: Cambridge University Press, Vol. 13, No. 1 (1931), pp. 43-55.

অধিকারী হবেন। মা তার ছেলে বা মেয়ে কারও সম্পত্তিতে ওয়ারিস হতে পারবে না। পিতার অবর্তমানে মা মৃত্যুবরণ করলে পুত্র সন্তান এককভাবে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। পুত্র সন্তান না থাকলে মেয়ে, ছেলে-মেয়ে কেউ না থাকলে পিতামাতা, পিতামাতা না থাকলে দাদা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।[৮]

খ্রিস্ট ধর্মে নারীর মীরাস

খৃষ্টানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয় সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫-এর মাধ্যমে। সাকসেশন অ্যাক্টের ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে:

ক. কোনো মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে একই মর্যাদার অধিকারী হয় এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে সমান অংশ লাভ করে। অর্থাৎ ছেলে মেয়ে সমান অংশে সম্পত্তি পায়।

খ. কোনো মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভাগ-বণ্টনের সময় আপন বৈমাত্রেয় ভাই বা বোন সমান মর্যাদার উত্তরাধিকারী হবে। অর্থাৎ সৎ ও আপন ভাইবোন সমান অংশে সম্পত্তি লাভ করবে।

গ. কোন মৃত ব্যক্তি যদি তার সম্পত্তি উইল করে যায়, তবে তা বিলি বণ্টন করা যাবে না। তবে উইল যদি আইনগত ত্রুটির কারণে অকার্যকর হয়, তবে সেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকীদের অধিকার জন্মাবে। পরিমাণ নিয়ে উইল করার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করতে পারেন।

খ্রিস্টান উত্তরাধিকারী আইনের বর্ণনা

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসকারী খৃষ্টানদের জন্য আলাদা কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বরং ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (Act 39 of 1925) এর ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ খৃষ্টানদের জন্য প্রযোজ্য।

সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫ এর ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

১. স্বামী বা স্ত্রী ঃ স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের সম্পত্তিতে নিম্নলিখিতভাবে উত্তরাধিকারী হবে:

---

৮. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: আহমদ শালাবী, *মুকারানাতুল আদইয়ান (আল-ইয়াহুদিয়্যাহ)*, (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১৯৬৬খ্রি.), পৃ. ২৭৫; মুহাম্মদ হাফেয সাবরী, *আল-মুকারানাত ওয়াল মুকাবালাত বায়না আহকামিল মুরাফা'আত ওয়াল মু'আমালাত ওয়াল হুদূদ ফীশ শারঈল ইয়াহুদী ওয়া নাযাঈরীহা মিনাশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ* (মিসর: মাতবা'আতু আমীন হিনদিয়্যাহ, ১৯০২খ্রি.), পৃ. ২৩; মুহাম্মদ শুহুদ, *ফিকহিল মাওয়ারিছ* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৮

হয়েছে যে, এদের না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন মাতার বেলায় বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা এবং কোন ভাই বা বোন থাকে, তখন মাতা সন্তানের উত্তরাধিকারী হবে না। এ আইনে বৈপিত্রেয় বোন, বৈমাত্রেয় বোন, দাদী-নানীর জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

এ আইনে আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হলোঃ স্বামী-স্ত্রী নয় এমন মিলনে যে সন্তান জন্ম লাভ করবে সে অংশ পাবে না। এখানে নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনকে বৈধ করা হয়েছে, অথচ জারজ সন্তানকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। অথচ শাস্তি দেয়া উচিৎ ছিল যাদের অবৈধ মিলনে এ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।[১]

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় উত্তরাধিকারে নারীর অংশ নিয়ে আলোচনার জন্য পবিত্র কুরআনের উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত উল্লেখ করা জরুরী। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে যেসব বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে উত্তরাধিকার আইন অন্যতম। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্র দুই কন্যার অংশের সমান পাবে, আর যদি কন্যা দুইয়ের অধিক হয় তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। একমাত্র কন্যা হলে অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতা-মাতা (প্রত্যেকে) ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তা হলে মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাইবোন থাকে,

---

১. আইন ও সালিশ কেন্দ্র, *খ্রিষ্টান পারিবারিক আইন* (ঢাকাঃ আইন ও সালিশ কেন্দ্র, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০০), পৃ. ৬-৯

তাহলে মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে; আর যদি তাদের কোন সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। এটা তারা যে অসিয়ত করে যায়, তা আদায় ও ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ এ সকল তোমাদের কৃত অসিয়ত আদায় ও ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতামাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্ঠাংশ। যদি তারা তদপেক্ষা বেশী হয়, তবে তারা সকলে একত্রে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে। এটা কৃত অসিয়ত আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। এ শর্তে যে, কারো ক্ষতি না করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল।"[১০]

তিনি আরও বলেনঃ

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

"(হে নবী) লোকেরা আপনাকে (উত্তরাধিকারের) বিধান জিজ্ঞাস করে, আপনি বলে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে পিতামাতাহীন নিসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন থাকে, তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে। এবং এ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকার হবে, যদি তার কোন সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দুইজন হয়, তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই বোন উভয়ে থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত।"[১১]

ইসলামী আইনে নারীর মীরাসের অংশসমূহ

উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে ইসলামী আইনে নারীর উত্তরাধিকারের যে অংশ নির্ধারিত হয় তা নিম্নরূপঃ

---

[১০] আল-কুরআন, ০৪ : ১১-১২

[১১] আল-কুরআন, ০৪ : ১৭৬

ক. যদি কোনো রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় যেমন সন্তান, পিতা, মাতা, ভাইবোন না থাকে, তবে স্বামী বা স্ত্রী পুরো সম্পত্তিই পাবে।

খ. যদি কোন সন্তান থাকে তবে স্বামী বা স্ত্রী পাবে সম্পত্তির $^{১}/_{৩}$ অংশ। সন্তানেরা সমানভাবে পাবে $^{২}/_{৩}$ অংশ।

গ. যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকে, তবে স্বামী বা স্ত্রী পাবে $^{২}/_{৩}$ অংশ। অন্য আত্মীয়-স্বজনরা $^{১}/_{৩}$ অংশ সমানভাবে বণ্টন করবে।

২. **সন্তান ঃ** মৃত পিতা বা মাতার সম্পত্তিতে সন্তানরা নিম্নলিখিতভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়-

ক. মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রী রেখে গেলে অথবা মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে স্বামী রেখে গেলে সন্তানগণ মৃত পিতা বা মাতার সম্পত্তিতে $^{২}/_{৩}$ অংশ লাভ করবে।

খ. মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা বা অন্যান্য রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা সম্পত্তি থেকে কোনো অংশ পাবে না।

গ. মৃত ব্যক্তির ছেলে ও মেয়ে সবাই সমান হারে সম্পত্তি পাবে।

ঘ. মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যার সাথে যদি মৃত সন্তানের পুত্র বা কন্যা থাকে, তবে এরা মৃত সন্তানের স্থলাভিষিক্ত হবে।

৩.**পিতা ঃ** মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে তখনই কেবল পিতা সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এ ক্ষেত্রে মৃতের স্ত্রী/স্বামীর অংশ ($^{২}/_{৩}$) বাদ দিয়ে বাকি অংশ ($^{১}/_{৩}$) পিতা পাবে।

৪. **মাতা ঃ** মাতা মৃতের উত্তরাধিকারী হবেঃ

ক. যখন মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা এবং কোন ভাই বা বোন না থাকে, তখনই কেবল মাতা সন্তানের উত্তরাধিকারী হবে।

খ. মৃত ব্যক্তির যদি শুধু ভাই বা বোন থাকে, তবে মা তাদের সাথে সমানভাবে পাবে।

গ. মৃত ব্যক্তির যদি স্বামী-স্ত্রী, সন্তান পিতা বা কোন ভাইবোন না থাকে, তবে মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

৫. **ভাইবোন এবং ভাইবোনের সন্তান ঃ** যখন মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পিতা-মাতা না থাকে তখনই কেবল ভাইবোন এবং তাদের সন্তানাদি উত্তরাধিকারী হবে।

খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইনের পর্যালোচনা

খৃষ্টান আইনে যে সমস্ত মহিলাকে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তাদের সংখ্যা মোট ৪ জন। যথা স্ত্রী, মেয়ে, বোন ও মাতা। এদের মধ্যে বোন ও মাতাকে এমন স্থানে রাখা

স্ত্রীর মীরাস

স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করবে। এর দুটি অবস্থা রয়েছেঃ

এক. মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে চার ভাগের এক;

দুই. সন্তান থাকলে আট ভাগের এক।

কেউ যদি একের অধিক স্ত্রী রেখে যান, তবে তাদের মিরাস বৃদ্ধি পাবে না। বরং উপরের অবস্থার আলোকে $^১/_৪$ ও $^১/_৮$ অংশ তাদের মধ্যে সমহারে বণ্টিত হবে।[১২]

কন্যার মীরাস

কন্যা তার পিতার উত্তরাধিকারী সম্পদ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তার তিনটি অবস্থা রয়েছেঃ

এক. কন্যা যদি একজন হয় এবং মৃতের কোন পুত্র সন্তান না থাকে, তবে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে;

দুই. কন্যা যদি একাধিক হয় এবং পুত্র সন্তান না থাকে, তবে সমস্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই অংশ পাবে;

তিন. কন্যার সাথে যদি পুত্র থাকে তবে প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ পাবে।[১৩]

মাতার মীরাস

মৃত ব্যক্তির মাতা তার সম্পত্তিতে অংশ পাবে। এ জন্য তিনটি অবস্থা বিদ্যমানঃ

এক. মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান থাকে বা পুত্রের সন্তান বা অধঃস্তন কেউ থাকে অথবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকে, তাহলে মাতা ছয় ভাগের এক পাবে;

দুই. মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান বা পৌত্র-পৌত্রী বা কোন অধঃস্তন অথবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন না থাকে তাহলে মাতা তিন ভাগের এক ভাগ পাবে;

তিন. মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান বা পৌত্র-পৌত্রী বা কোন অধস্তন অথবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর এবং মৃত ব্যক্তি নারী হলে স্বামীর অংশ দেয়ার পর মাতা তিনভাগের এক ভাগ পাবে।

সহোদর বোনের মীরাস

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সহোদর বোন মীরাস পাবে। এর তিনটি অবস্থা রয়েছেঃ

---

১২. শায়খ ইবনু উছায়মিন, *ফিকহুল মাওয়ারিস* (মিসরঃ দারে ইবনে জাওজী), পৃ. ৭৫

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

এক. সহোদর একজন হলে অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হবে;

দুই. দুই বা ততোধিক হলে সবাই মিলে দুই তৃতীয়াংশের মালিক হবে;

তিন. মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রীগণ থাকলে বোন আসাবা[১৪] হবে। অর্থাৎ উল্লেখিত দুইজন অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট থাকলে তারা অংশ পাবে।

পৌত্রীদের মীরাস

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পৌত্রীদের (পুত্রের কন্যাদের) অংশ রয়েছে। এ জন্য কয়েকটি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়:

এক. যদি মৃত ব্যক্তির কোন কন্যা সন্তান না থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে;

দুই. পৌত্রী যদি একাধিক হয় এবং কোন কন্যা সন্তান না থাকে তবে পাবে দুই তৃতীয়াংশ;

তিন. মৃত ব্যক্তির কন্যা সন্তান থাকলে পৌত্রীগণ পাবে ছয় ভাগের এক।

বৈমাত্রেয় বোনের মীরাস

মা দুইজন কিন্তু পিতা একজন হলে অর্থাৎ পিতার অন্য স্ত্রীর গর্ভের কন্যা সন্তানকে বৈমাত্রেয় বোন বলা হয়। মৃত ব্যক্তির এমন বোন মীরাস পায়। তবে তাদের কয়েকটি অবস্থা অতিক্রম করতে হবে :

এক. এমন একজন বোন হলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে;

দুই. দুই বা ততোধিক হলে সবাই মিলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে তবে শর্ত মৃতের কোন সহোদর বোন থাকতে পারবে না;

তিন. মৃত ব্যক্তির একজন সহোদর বোন থাকলে সে ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সকলেই পাবে এক ষষ্ঠাংশ;

চার. সহোদর দুই বা ততোধিকের বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোনের সাথে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে অথবা মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রী বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয় বোনগণ আসাবা হবে। সহোদর বোনগণ তাদের তিনভাগের দুই ভাগ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা বৈমাত্রেয় ভাইবোনগণ পাবে।

বৈপিত্রেয় বোনের মীরাস

পিতা দুইজন; কিন্তু মাতা একজন। এ ধরনের বোনও মৃত ব্যক্তির মীরাস পাবে। তার জন্য কয়েকটি অবস্থা রয়েছে:

---

১৪. আসাবাঃ আসাবা মানে দল, সংঘ, স্বগোত্র ব্যক্তি, জ্ঞাতি, স্নায়ু, স্নায়ুকোষ ইত্যাদি। ফারায়িযের পরিভাষায় যাদের জন্য কুরআন-হাদীসে অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি, কিন্তু তারা আসহাবুল ফারায়িয বা যাবিল ফুরুযের অংশগ্রহণ করার পর অবশিষ্টাংশ সম্পদের হকদার হয়।

এক. যদি একজন হয় তবে এক ষষ্ঠাংশ পাবে;

দুই. বৈপিত্রেয় বোন দুই বা ততোধিক হলে কিংবা বৈপিত্রেয় বোনের সাথে বৈপিত্রেয় ভাই থাকলে সবাই মিলে এক তৃতীয়াংশ।

দাদীর মীরাস

কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে দাদী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিস হবে। মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা মাতা না থাকলে দাদী এক ষষ্ঠাংশ পাবেন।

মীরাসে নারীর অংশসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

উপরে বিভিন্ন ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, ধর্মসমূহ নারীর উত্তরাধিকার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। নিম্নে নারী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মে[৫] নির্ধারিত তাদের উত্তরাধিকারের অংশ উপস্থাপন করা হলো:

মা হিসেবে

বিভিন্ন ধর্মে মৃতের মায়ের নির্ধারিত মিরাস নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতের সন্তান থাকলে	৪র্থ শ্রেণিভুক্ত	√	×	×	√
মৃত নিঃসন্তান হলে	ঐ	√	×	√	√

সারণি-৩ : বিভিন্ন ধর্মে মায়ের মীরাস

স্ত্রী হিসেবে

মৃতের স্ত্রীর মিরাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের অবস্থান নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতের সন্তান থাকলে	৪র্থ শ্রেণিভুক্ত	×	×	√	√
মৃত নিঃসন্তান হলে	ঐ	×	√	√	√

সারণি-৪: বিভিন্ন ধর্মে স্ত্রীর মীরাস

---

[৫] এখানে হিন্দুধর্ম দ্বারা দায়ভাগ পদ্ধতি, বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা মায়ানমারের বার্মান বৌদ্ধ এবং খ্রিস্ট ধর্ম দ্বারা ১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন বুঝানো হয়েছে।

কন্যা হিসেবে

বিভিন্ন ধর্মে মৃতের কন্যার মিরাসীস্বত্ব নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতের পুত্র থাকলে	৪র্থ শ্রেণিভুক্ত[১৬]	×	×	√	√
শুধুমাত্র ১ বোন হলে	ঐ	×	√	√	√
ভাই ছাড়া একাধিক বোন হলে	ঐ	×	√	√	√

সারণি-৫: বিভিন্ন ধর্মে কন্যার মীরাস

বোন হিসেবে

বিভিন্ন ধর্মে মৃতের বোনের নির্ধারিত মিরাস নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতের ছেলে/ ছেলেমেয়ে থাকলে	×	×	×	×	×
মৃতের ছেলে ছাড়া মেয়ে থাকলে	×	×	×	×	আসাবা
মৃতের সন্তান না থাকলে	×	√	×	√	√
বৈপত্রেয় বোন	×	×	×	×	√
বৈমাত্রেয় বোন	×	×	×	×	√

সারণি-৬: বিভিন্ন ধর্মে বোনের মীরাস

দাদী হিসেবে

মৃতের দাদির মিরাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের অবস্থান নিম্নরূপ:

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতের পিতমাতা থাকলে	×	×	×	×	×
মৃতের পিতামাতা না থাকলে	৪র্থ পর্যায়ে	√	×	×	√

সারণি-৭: বিভিন্ন ধর্মে দাদীর মীরাস

১৬. ২০০৫ সালের আইনে বোনের সমান অধিকার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পৌত্রী হিসেবে

বিভিন্ন ধর্মে মৃতের পৌত্রীর মিরাসীস্বত্ব নিম্নরূপঃ

অবস্থা	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	ইয়াহুদী ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম	ইসলাম
মৃতেরমেয়ে বা ছেলে থাকলে	×	×	×	√	√

সারণি-৩ঃ বিভিন্ন ধর্মে মায়ের মীরাস

বিভিন্ন ধর্মে নারীর মীরাসের অংশ নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেঃ

- জাহিলি যুগে মীরাসের মানদণ্ড ছিল দুটি : বংশ ও কারণ। বংশের দিক দিয়ে যে মীরাস দেয়া-নেয়া হতো, তাতে বালক শিশু ও নারীদেরকে মীরাস দেয়া হতো না। অন্যদিকে কারণ হেতু মীরাস দেয়া হতো বীর পুরুষ যুদ্ধবাজ সন্তানদেরকে, যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করে আনত।
- অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামে নারীদেরকে জীবনস্বত্বে মিরাস দেয়া হয়নি। জীবনস্বত্ব বলতে বুঝায় জীবন যতদিন আছে ততদিন তা শুধু ভোগ করতে পারবে। ঐ পরিবারের অন্য কোন পুরুষের সহায়তা ব্যতীত তা বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে তাদেরই স্বত্ব হিসাবে গণ্য হয়। তারা এটি যেভাবে চান সেভাবে ভোগ ব্যবহার করতে পারবেন। তারা তা নিজের কাছে রেখেও দিতে পারেন অথবা প্রয়োজন হলে বিক্রি, বন্ধক, হেবা, দান বা অন্যভাবে হস্তান্তরও করতে পারেন। এতে পরিবারের কারো সহায়তার প্রয়োজন নেই।
- কোন কোন ধর্মে মহিলাদেরকে এমন স্থান বা পর্যায়ে রাখা হয়েছে যে, তাদের মিরাস লাভে অনেকটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কিন্তু ইসলামের মিরাস বণ্টন পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, মহিলারা কোন ক্রমেই বঞ্চিত হয় না। স্ত্রী, কন্যা ও মাতা যে কোন পরিস্থিতিতে বা যে কোন পর্যায়ে হোক না কেন, অবশ্যই মীরাস পাবে। যেমন জনৈক পুরুষ লোক মৃত্যুর সময় ছেলে, মেয়ে, পৌত্র, পৌত্রী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, চাচা, তিন প্রকারের ভাই ও বোন (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়) রেখে গেলেও স্ত্রী, কন্যা ও মাতা মীরাস পাবেই।
- ইসলামের মীরাসী আইনে নিম্নলিখিত ছয়জন আত্মীয় কোন অবস্থাতেই মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় না (১) পিতা (২) মাতা (৩) পুত্র (৪) কন্যা (৫) স্বামী ও (৬) স্ত্রী। এ ছয়জনের অর্ধেকই নারী।

- আল-কুরআনে নারীর অংশ নির্ধারিত করে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে যাবিল ফুরুযের[১৭] অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাবিল ফুরুয মোট ১২ জন। এ ১২ জনের মধ্যে ৪ জন মাত্র পুরুষ এবং বাকি ৮ জনই মহিলা। অর্থাৎ নারীরা পুরুষের দ্বিগুণ। এত অধিক সংখ্যক মহিলার মীরাস লাভ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদে পরিলক্ষিত হয় না।
- আল্লাহর বাণীঃ "এক পুত্র দুই কন্যার সমপরিমান অংশ পাবে" অর্থাৎ পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পাবে। মনে রাখা প্রয়োজন, এখানে পুত্রের অংশকে কন্যার অংশের ওপর ভিত্তি করা হয়েছে। পুত্রের অংশ কমবেশি পাওয়া বা না পাওয়ার ব্যাপারে কন্যার অংশকেই মূলভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে বোন, বৈপিত্রেয় বোনের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী তথা মাতার দিক দিয়ে সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছে।
- ইসলামের মীরাসী আইন অনুসারে কন্যার অংশ সকল অবস্থায় সমান। অর্থাৎ কন্যা অবিবাহিতা বা বিবাহিতা, পুত্র বা কন্যার মা, বন্ধ্যা যাই হোক সকল অবস্থায় পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাবে। অন্ধ, বোবা, বধির, দূরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হলেও সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বেঁচে থাকলেও কন্যা অংশ পাবে।
- ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোন ও পৌত্রীর মীরাস রয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এদের জন্য অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদে মীরাসের কোন অংশ রাখা হয়নি।
- স্ত্রী সকল অবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মীরাস পাবে। মৃতের অন্য কোন ওয়ারিস জীবিত থাক আর না থাক, কোন অবস্থাতেই স্ত্রী বঞ্চিত হবে না। স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও বঞ্চিত হবে না।
- মৃত ব্যক্তির মাতা সর্বাবস্থায় মীরাস পাবে। মৃতের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র. স্ত্রী, কন্যা এবং পিতা জীবিত থাকলেও মাতা অংশ পাবে। প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তার ইচ্ছামত ব্যয়, দান, বিক্রয় ও হস্তান্তর করতে পারবেন।

---

[১৭] **যাবিল ফুরুয বা আসহাবুল ফারায়িয** (নির্ধারিত অংশের অধিকারীগণ): যাদের অংশ কুরআন ও হাদীসে নির্ধারিত রয়েছে। এরা মোট ১২ জন। ৪ জন পুরুষ যথাঃ (১) পিতা, (২) দাদা অর্থাৎ পিতার পিতা (৩) বৈপিত্রেয় ভাই ও (৪) স্বামী এবং ৮ জন মহিলা যথাঃ (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) নাতনী, (৪) সহোদরা বোন (৫) বৈপিত্রেয় বোন, (৬) বৈমাত্রেয় বোন, (৭) মাতা ও (৮) দাদী-নানী।

উপসংহার

উপরে ইসলামসহ কয়েকটি ধর্ম তথা ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধদের মীরাসী আইনে নারীর অধিকারের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয়, সার্বিকভাবে ইসলাম নারীকে অধিকার প্রদানের দিক থেকে অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। ইসলাম নারীকে যতটুকু সম্মান ও ইজ্জতের আসনে আসীন করেছে অন্য ধর্ম তা করেনি। বরং বিভিন্নভাবে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত করেছে। জীবনস্বত্ব নামক অপমান ও লাঞ্ছনামূলক উত্তরাধিকার প্রদান করে নারীকে খাট করা হয়েছে। কোন কোন ধর্মে কোন কোন অবস্থায় ওয়ারিসদের দীর্ঘ তালিকায় নারীকে এমন স্থান দেয়া হয়েছে যে, তাদের মীরাস না পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। বর্তমান বিশ্বে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও নারীর যথার্থ অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাই ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বিকল্প নেই।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন : ২০১৬

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩ : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম*

Parents Maintenance Act 2013 : an Analytical study

Abstract

With the current socio-economic context in Bangladesh the Government of Bangladesh has enacted Parents Maintenance Act 2013. In fact, parents have a significant position in the lives of every human being. They even exaust their all abilities and capacities to ensure a bright future for their children. Thus at a stage they become old aged and dependent on their children. Therefore, once the children become grown-up and capable it is their obligation to perform their overall duties of maintenance of their parents. Against this backdrop, the Government of Bangladesh has enacted this law, which is the first law of this kind in Bangladesh. Most of the people in Bangladesh are Muslims. It is to be noted that Islam has also given due emphasize on performing duties towards parents. This article critically analyses this act introduced by the Government of Bangladesh in light of the Holy Quran and the Sunnah and presents necessary recommnedations therein. The article has been prepared following a critical analytical method of description. This article offers understanding of the above act in the Islamic perspective by offering a comparative assessment of this act with Islamic Sharī‘ah.

Keywords: parents; maintenance; children; good manners; law

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনায় পিতা-মাতা তিলে তিলে নিজের জীবন ও সামর্থ্যকে ক্ষয় করে এক সময় বার্ধক্যে উপনীত হন, কর্মক্ষম হাত পাগুলো নিশ্চল হয়ে পড়ে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন সন্তানের উপর। তাই সন্তান যখন সামর্থ্যবান হবে, তখন পিতা-মাতার সার্বিক ভরণ-পোষণ তাদের দায়িত্ব ও আবশ্যকীয় কর্তব্য। আইনটি এ বিষয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আইন। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক মুসলিম। ইসলামেও পিতা-মাতার সার্বিক সেবাযত্নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনটির পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হবে। প্রবন্ধটি প্রণয়নে বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সমালোচনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অত্র আইনের নানা অনুষঙ্গের ইসলামী দৃষ্টিকোণ অবগত হওয়ার পাশাপাশি এ বিষয়ক ইসলামী আইনের সাথে তুলনা করা সম্ভব হবে।

শব্দ সংকেত : পিতা-মাতা; ভরণ-পোষণ; সন্তান; সদাচরণ; আইন।

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর খলীফা হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং তার জীবন পরিচালনার জন্য পথ দেখিয়েছেন। এজন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। মানুষের পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যম হলো তার পিতা-মাতা। পৃথিবীতে একজন মানব সন্তান আগমনের পূর্বে ও পরে পিতা-মাতা তার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের লালন পালন করেন। পিতা-মাতার মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানুষের বিস্তার ও বংশ পরিক্রমা নির্ধারিত হয়। পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখার সৌভাগ্য মানুষ পিতা-মাতার মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। তাই মানুষের জীবনে পিতা-মাতার স্থান ও অধিকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্র অধিকারের পাশাপাশি পিতা-মাতার অধিকারের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। সন্তানের নিকট থেকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সদাচরণ পাওয়া পিতা-মাতার নৈতিক ও আইনী অধিকার। বিশেষভাবে তারা যখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন এবং কর্মক্ষম থাকেন না, তখন তারা ভরণ-পোষণ ও সেবা-যত্ন পাওয়ার জন্য সন্তানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সন্তানের কর্তব্য, তার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করা, অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং তাঁদেরকে সঙ্গ দেয়া এবং তাদের মনে কষ্ট পাবার মতো কোন ব্যবহার না করা।

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩

সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩ শিরোনামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনটি ২৭ অক্টোবর ২০১৩/ ১২ কার্তিক ১৪২০ তারিখ রোববার রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা হিসেবে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত ও বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

আইনটি প্রণয়নের কারণ

'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ' আইনটি প্রণয়নের কারণ বা ব্যাখ্যা গেজেটে উল্লেখ করা হয়নি। তবে আইনে বলা হয়েছে, 'যেহেতু সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।' মূলত বাংলাদেশের বর্তমান সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের স্খলনের কারণে পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্ববোধে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। পিতা-মাতাসহ সমাজের বৃদ্ধ ও প্রবীণ শ্রেণীর প্রতি দায়িত্ব পালন ও তাঁদের প্রতি গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে প্রায়ই পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণের সংবাদ পরিলক্ষিত হয়। এ দেশের নব্বই শতাংশ লোক মুসলিম হলেও পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতিতে মুসলিম সমাজে ইসলামী অনুশাসনের যথাযথ চর্চা নেই এবং ইসলামের শিক্ষা, বিধি-বিধান ও আইন পরিপালনে শিথিলতা লক্ষণীয়। এ প্রেক্ষিতে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩'-এর পর্যালোচনা

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ বিষয়ে প্রণীত এটিই প্রথম আইন। সাধারণ মানুষের মধ্যে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে আইনটির পর্যালোচনা ও সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা করা হলো:

০১. শিরোনাম ও সংজ্ঞা

"পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩" শিরোনামে আইনটি ২০১৩ সনের ৪৯ নং আইন, যা সংসদ কর্তৃক গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি লাভ করেছে। উক্ত আইনে ধারা ২(ক) তে পিতা বলতে সন্তানের জনককে বুঝানো হয়েছে।

'ভরণ-পোষণ' বলতে খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং সঙ্গ প্রদানকে বুঝানো হয়েছে। 'সন্তানের মাতা' বলতে সন্তানের গর্ভধারিণী এবং 'সন্তান'

বলতে পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণকারী সক্ষম ও সামর্থ্যবান পুত্র বা কন্যাকে বুঝানো হয়েছে।[১]

- **সীমাবদ্ধতা**

➢ **অসদাচরণ-এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি**

উল্লিখিত আইনে ভরণ-পোষণ অর্থ খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বসবাসের সুবিধা এবং সঙ্গ প্রদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, শ্রদ্ধাবোধ, কর্কশ ভাষায় কথা না বলা, কষ্ট না দেয়া, তাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাদের আনুগত্য স্বীকার করা ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অনেক সময় শারীরিকভাবে কষ্টের মতোই মানসিক কষ্টও পীড়াদায়ক এবং নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে।

➢ **'সক্ষম' ও 'সামর্থ্যবান'-এর ব্যাখ্যা অনুপস্থিত**

আইনের ২ নং ধারার (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সন্তান' বলতে পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে জন্ম নেয়া সক্ষম ও সামর্থ্যবান পুত্র বা কন্যাকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু 'সক্ষম' ও 'সামর্থ্যবান'-এর কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। আমাদের সমাজে শিক্ষিত অনেক বেকার রয়েছেন, যারা যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান পাচ্ছেন না। এ ছাড়া পিতা-মাতার সন্তান যদি বেকার থাকে অথবা যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি না পায়, তাহলে এ আইনের আলোকে সে কীভাবে দায়িত্ব পালন করবে তার বিকল্প কোন দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি। 'সক্ষম' ও 'সামর্থ্যবান-এর বয়স নির্ধারিত নেই এবং সংজ্ঞাও দেয়া হয়নি।

➢ **পুত্র ও কন্যার ওপর সমান আর্থিক দায়িত্ব আরোপ**

আইনটির ২ নং ধারার আলোকে বলা যায়, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে সক্ষম ও সামর্থ্যবান পুত্র বা কন্যাকে সমানভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে । কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় আর্থিক সংগতি ও দায় দায়িত্ব পুরুষ ও নারীর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হতে দেখা যায় না। আর্থিক বিষয়ে সামর্থ্য ও দায়িত্ব পুত্র বা পুরুষগণ বেশি পালন করে থাকেন। কন্যা বা নারীগণ বিবাহ-পরবর্তী জীবনে স্বামীর সংসারের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অনেক সময় নারীদের কোন নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা থাকে না এবং আর্থিক বিষয়ে তারা স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ সকল অবস্থায় পুত্র ও কন্যা উভয়ের আর্থিক সক্ষমতা সমান না হওয়া সত্ত্বেও সমান দায়িত্ব পালন কতটুকু সম্ভব তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যা উক্ত আইনে সুস্পষ্ট নয়।

---

১. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩, বাংলাদেশ গেজেট, রেজিস্টার্ড নং ডি, এ-১ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত ও বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। আইন নং ৪৯, ধারা-২

ইসলামী ফিক্‌হ প্রদত্ত 'পিতা-মাতা' ও 'ভরণ-পোষণ'-এর সংজ্ঞা

'পিতা ও মাতা'-এর সংজ্ঞায় ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ 'আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ'তে বলা হয়েছে, পিতা এর অর্থ জন্মদাতা, যার বীর্য থেকে আরেকজন মানুষ জন্মগ্রহণ করে। এর আরবী প্রতিশব্দ হল 'আব' (أَبٌ)। 'আব' শব্দটির কয়েকটি বহুবচন রয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো 'আবা' (آبَاء)। পরিভাষায়, এমন ব্যক্তিকে পিতা বলা হয়, সরাসরি যার শরীয়তসম্মত স্ত্রীর সাথে যৌন সংসর্গের ভিত্তিতে আরেক মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যে নারী অপরের সন্তানকে দুধ পান করায়, সাধারণত তার স্বামীকেও দুধপানকারীর পিতা বলা হয়।[২] পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নবী।[৩]

অভিধানে কোন কিছুর মূলকে উম্মুন বা মাতা বলা হয়। 'উম্মুন' অর্থ মাতা; জননী। আরবীতে শব্দটির বহুবচন 'উম্মাহাত' ও 'উম্মাত'। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম শব্দটি মানবজাতির জন্য এবং দ্বিতীয় শব্দটি জীবজন্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়। ফকীহগণ বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে মানুষ জন্মলাভ করে তিনি সেই মানুষের প্রকৃত মাতা। আর যে নারীর সন্তান কাউকে জন্ম দেয় সেই নারীও রূপকার্থে তার মাতা। পিতার মা হলে তিনি দাদী এবং মায়ের মা হলে তিনি নানী। যে মহিলা কোন শিশুকে দুধ পান করান, অথচ তাকে গর্ভে ধারণ করেননি, তিনি তার দুধমাতা।[৪]

পবিত্র কুরআনে এ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ

আর আমি মূসা-এর মায়ের প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম যে, তাকে দুধ পান করাতে থাক।[৫]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছেন। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।[৬]

---

২. আবদুল মান্নান তালিব (প্রধান সম্পা.), *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ, ইসলামের পারিবারিক আইন* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২), খ. ১, পৃ. ৯১

৩. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪০

৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ,* পৃ. ৮৪

৫. আল-কুরআন, ২৮ : ০৭

৬. আল-কুরআন, ৫৮ : ০২

আরবীতে জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীকে যথাক্রমে والد ও والدة বলা হয়। অতএব পিতা-মাতার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে এ আইন ও ফকীহগণের মতামতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

'ভরণ-পোষণ' শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হলো নাফাকাতুন। এর অর্থ হলো খরচ, ব্যয়, জীবন নির্বাহের ব্যয়, খোরপোষ। পরিভাষায়, 'নাফাকাহ' বা খোরপোষ হলো অপচয় ছাড়া যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ জীবনধারণ করে।[৭] অর্থাৎ যা জীবন ধারণের ভিত্তি। সুতরাং জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদাসমূহ তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, 'তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর, নিশ্চয় সে ব্যাপারে আল্লাহ্ সুপরিজ্ঞাত।[৮]

'নাফাকাতুন' পরিভাষাটির সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি পরিভাষা হলো 'আল-'আতা' (العطاء) অর্থাৎ বৃত্তি, অনুদান। রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হকদারদের জন্য বায়তুলমাল থেকে যা নির্ধারণ করেন তাকে আল-'আতা বা বৃত্তি বলা হয়। 'নাফাকাহ' ও 'আতা'-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 'নাফাকাহ' শরী'আহ্ কর্তৃক ধার্য হয়, আর 'বৃত্তি' রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান কর্তৃক ধার্য হয়।[৯] এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ্ তাকে যা দান করেছেন তা হতে দান করবে।[১০]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।[১১]

---

৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ১০৩

النَّفَقَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ : مَا بِهِ قِوَامُ مُعْتَادُ حَالِ الآدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ .

৮. আল কুরআন ০২ : ২১৫

৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ১০৪

১০. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৭

১১. আল-কুরআন, ০২ : ২৩৩

০২. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ

আইনের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সন্তানকে তার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন পিতা-মাতার একাধিক সন্তান থাকলে তারা আলোচনার মাধ্যমে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন এবং তা নিশ্চিত করার জন্য সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতার সাথে একসঙ্গে এবং একস্থানে বসবাস নিশ্চিত করতে হবে।[১২]

আইনের ৩ নং ধারার (৪) এ বলা হয়েছে, পিতা-মাতাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ নিবাসে বসবাস করতে বাধ্য করা যাবে না কিংবা আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য করা যাবে না। ধারা ৩ (৪) নং উপধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সন্তান তাঁর পিতা-মাতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করবে। ৩নং ধারার (৬) নং উপধারায় বলা হয়েছে, পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে সন্তান থেকে পৃথক বসবাস করলে সেক্ষেত্রে তাদের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে হবে।

আইনের ৩নং ধারা এর (৭) নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতা সন্তানদের সাথে বসবাস না করে পৃথকভাবে বসবাস করলে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তান তার মাসিক বা বাৎসরিক আয় হতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ তার পিতা বা মাতা বা ক্ষেত্র হিসেবে উভয়কে নিয়মিতভাবে প্রদান করবে।

- **সীমাবদ্ধতা**
  - **সন্তানদের সাথে একত্রে বসবাস**

উল্লিখিত আইনের ৩ নং ধারায় ১ থেকে ৭ পর্যন্ত মোট সাতটি উপধারায় ভরণ-পোষণের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যথা পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করা, একাধিক সন্তানের ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা, বৃদ্ধ নিবাসে বসবাসে বাধ্য না করা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করা এবং মাসিক আয় থেকে অর্থ প্রদান করা।

৩ নং উপধারায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার জন্য সন্তানকে পিতা-মাতার সাথে একইসঙ্গে একইস্থানে বসবাস নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে একক পরিবার প্রথা গড়ে ওঠছে। কর্মসংস্থানের তাগিদে গ্রাম অঞ্চল থেকে মানুষ শহরমুখী হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে এর দিক নির্দেশনা অনুপস্থিত। এ ছাড়া কর্মজীবী সন্তানদের তাদের পিতা-মাতার সাথে একই স্থানে বসবাস করার বিধান বাধ্যতামূলক করা হলে তা নতুন জটিলতা তৈরি করবে। উপেক্ষা নয়; সম্মান ও সহানুভূতি বজায় রেখে পিতা-মাতাকে তাদের পছন্দনীয় আবাসস্থলেই রাখা বেশি কল্যাণজনক হবে।

---

[১২] পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩, ধারা-৩

➢ যুক্তিসঙ্গত ভরণ-পোষণ-এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি

৭নং উপধারায় বলা হয়েছে, পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে সন্তানের সাথে বসবাস না করে পৃথকভাবে বসবাস করলে সে ক্ষেত্রে সন্তান তার দৈনন্দিন আয় রোজগার বা মাসিক আয় বা বার্ষিক আয় থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পিতা-মাতাকে প্রদান করবে। এ ধারায় 'যুক্তিসঙ্গত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; কিন্তু এর সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। ২নং ধারায় 'ভরণ-পোষণ' বলতে খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বসবাসের সুবিধার কথা বলা হয়েছে। ৭নং উপধারায় বর্ণিত 'যুক্তিসঙ্গত' অর্থ দ্বারা ২নং ধারার 'ভরণ-পোষণ' সম্পন্ন হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ দ্বারা ভরণ-পোষণ সম্ভব না হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অথবা সন্তানের আয় দ্বারা তার নিজেরই খরচ সংকুলান না হলে অথবা সন্তান নিজেই যদি পিতা-মাতার উপর বোঝা হয়ে থাকেন তাহলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এর দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করা হয়নি।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
>
> আমি মানুষদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে। এমন কি যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছেছে এবং তারপর চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তখন বলেছে : "হে আমার রব, তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নিয়ামত দান করেছো আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ করো। আমার জন্য আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমি নির্দেশের অনুগত (মুসলিম) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৩]

আলোচ্য আয়াতে ওসিয়ত শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ নির্দেশ এবং ইহসান অর্থ সদ্ব্যবহার। এর মধ্যে সেবা-যত্ন, আনুগত্য, সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত। 'কুরহুন' (كره) শব্দের অর্থ সে কষ্ট যা মানুষ কোন কারণবশত সহ্য করে থাকে অথবা যে কষ্ট সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ।[১৪] অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্য জরুরী হবার কারণ এই যে, তারা

---

১৩. আল-কুরআন, ৪৬ : ১৫

১৪. মুফতী মুহাম্মদ শাফী রহ., *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (মদীনা মুনাওওয়ারাহ : বাদশাহ ফাহাদ মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১২৪৯

তোমাদের জন্য অনেক কষ্টই সহ্য করেছেন। এই আয়াতে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত রয়েছে, তা হলো মাতার হক পিতার হক অপেক্ষা বেশি, যা আমরা হাদীস থেকে প্রমাণ পাই। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك.

> এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার উত্তম সাহচর্যের অধিকতর হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা।[১৫]

পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি

পিতা-মাতার সেবা করা এবং তাদের অনুগত হওয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন, যার মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম হয়। অন্যদিকে তাদের অধিকার পদদলিত কিংবা অবহেলিত হলে তাদের অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের রাস্তাও খুলে যেতে পারে। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। তাদের আনুগত্য করলে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়। এর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক কল্যাণ ও সওয়াব রয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় গুরুত্ব রয়েছে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ স.-এর একটি হাদীসে এসেছে, ইবনে উমার রা. বলেন, (কারো প্রতি তার) পিতা সন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার পিতা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও অসন্তুষ্ট থাকেন।[১৬]

০৩. পিতা-মাতার অবর্তমানে দাদাদাদী, নানানানীর ভরণ-পোষণ

আইনের ৪ নং ধারায় পিতার অবর্তমানে দাদাদাদীকে এবং মাতার অবর্তমানে নানানানীকে ভরণ-পোষণের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের এই ভরণ-পোষণ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ হিসেবে গণ্য হবে।[১৭]

---

১৫. ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, কিতাবুল আদব, বাবু মান আহাক্কুন নাসি বিহুসনিস সুহবাহ, হাদীস নং ৫৬২৬

১৬. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা (ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০১), অনুচ্ছেদঃ কওলুহু তা'য়ালাঃ ওওয়াস-সাইনাল ইনসানা বি ওয়লিদাইহি ইহসানা, পৃ. ৩৩, হাদীস নং ২

عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد و سخط الرب في سخط الوالد

১৭. *পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন*, ২০১৩, ধারা-৪

সীমাবদ্ধতা

আইনের ৪নং ধারায় পিতার অবর্তমানে দাদাদাদীকে এবং মাতার অবর্তমানে নানানানীকে ভরণ-পোষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন সন্তানের পিতা ও দাদা একইসাথে বর্তমান থাকাবস্থায় পিতা অক্ষম বা অবসর জীবনযাপন করলে কিংবা পিতা আয় করতে সক্ষম না হলে উক্ত সন্তানের উপরই তার পিতা ও দাদার দায়িত্ব একই সাথে বর্তাবে কিনা তা বলা হয়নি। আর যদি এ অবস্থায় পিতা ও দাদার দায়িত্ব বর্তায় তাহলে তার উপর একাধিক দায়িত্ব বর্তাবে। তা পালনে সে সক্ষম না হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা উল্লেখ করা হয়নি।

জমহুর ফকীহ (হানাফী, শাফিঈ, হাম্বলী)-এর মতে, পৌত্র ও পৌত্রীর উপর দাদার ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব। তিনি পিতার দিক থেকে (দাদা) হোন কিংবা মাতার দিক থেকে (নানা)। ওয়ারিস হন বা না হন এবং অন্য ধর্মের অনুসারী হলেও। যেমন পৌত্র মুসলিম ও দাদা কাফির অথবা দাদা মুসলিম ও পৌত্র কাফির। কেননা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا 'আর পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।'[১৮] তাদের প্রয়োজন পূরণ করা সদ্ভাবে জীবনযাপনের অংশ। হাদীসে এসেছে, إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ. 'নিশ্চই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমাদের সন্তানদের উপার্জন ভক্ষণ করো।'[১৯] উপরন্তু, দাদা পিতার সাথে সংযুক্ত, যদিও তিনি পিতা শব্দের আওতাভুক্ত নন।[২০]

অপরাধের দণ্ড

আইনের ৫ নং ধারার ১ নং উপধারায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ না করার দণ্ড বর্ণনা করা হয়েছে। কোন সন্তান কর্তৃক ধারা ৩ এর যে কোন উপধারার বিধান কিংবা ৪নং বিধান লংঘন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে বা উক্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব তিন মাস কারাদণ্ড ভোগের বিধান রাখা হয়েছে।

আইনের ৫ নং-এর ২ নং উপধারায় বলা হয়েছে, কোন সন্তানের স্ত্রী বা ক্ষেত্র অনুযায়ী স্বামী কিংবা পুত্র কন্যা বা অন্য কোন নিকটাত্মীয়, পিতা-মাতা বা দাদাদাদী বা নানানানীর ভরণ-পোষণ প্রদানে বাধা প্রদান করেন অথবা অসহযোগিতা করেন

---

১৮. আল-কুরআন, ৩১ : ১৫

১৯. আবু দাউদ (সম্পা. ইজ্জত উবাইদ দা'আস) খ. ৩, পৃ. ৮০১, ইবনে মাজাহ (সম্পা.আলা হালাবী) খ. ২, পৃ. ৭৬৯, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেন। *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ,* খ. ১, পৃ. ৯৮

২০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ,* খ. ১, পৃ. ৯৮

তিনিও অনুরূপ অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেছেন বলে গণ্য হবে এবং উপধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[২১]

- **সীমাবদ্ধতা**

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন অনুযায়ী পিতা-মাতার ভরণ পোষণ না দিলে অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড বা অনাদায়ে সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। শাস্তি প্রয়োগের দ্বারা অপরাধের জাগতিক প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে; কিন্তু তাতে পিতা মাতার অসহায়ত্বের প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা নেই।

ইসলামে পিতা-মাতার অবাধ্যতাকে বড় পাপ ও কবীরা গুনাহ্ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পিতা-মাতার অবাধ্যতার জন্য কোন শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। তবে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী শাস্তির বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আলিমদের সমন্বয়ে গঠিত শরী'আহ্ কাউন্সিল কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে তা প্রণয়নের পরামর্শ দিতে পারেন।

- **পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহ্**

পিতা-মাতার অবাধ্য হলে এতে তারা কষ্ট পাবেন। তাদের কষ্ট দেয়া হারাম। এজন্য তাদের বৈধ আদেশ যা শরী'আহ্ পরিপন্থী নয় তা মান্য করা সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাদের আনুগত্য করতে গিয়ে যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তা পালন করা যাবে না।

আবু বকরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বললেন:

> الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا الا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت
>
> **আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মকগুলো সম্পর্কে অবহিত করবো না? কথাটি তিনি তিনবার বললেন। উত্তরে সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন: আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ করা। তিনি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন: এবং মিথ্যা বলা। তিনি এ কথাটি বারবার বলছিলেন। আমি মনে মনে বললাম, আহা! তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন।**[২২]

পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি দ্রুত কার্যকর হয়

ইসলামে আনুগত্য প্রাপ্তির অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ আল্লাহ্র নির্দেশেরই আনুগত্য। তাই পিতা-মাতার অবাধ্যতা প্রকারান্তরে

---

২১. *পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন,* ২০১৩, ধারা-৫

২২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* হাদীস নং ৫৪৩৮

আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনেরই নামান্তর। পিতা-মাতার বদদোয়া সন্তানের জন্য দুনিয়াতেই কার্যকর হয়ে যায়। আবু বাকরাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন:

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

পিতা-মাতার আবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি দুনিয়াতে অন্যান্য পাপের চেয়ে দ্রুত অপরাধীর উপর কার্যকর হয়। পরকালের শাস্তি তো আছেই।[২৩]

পিতা-মাতাকে কাঁদানো কবীরা গুনাহ

পিতা-মাতাকে কাঁদানোর অর্থ তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে তাদের মনে কষ্ট দিয়ে তাঁদের কাঁদানো। পবিত্র কুরআনে তাই তাঁদের সম্মুখে উহ্ শব্দটি উচ্চারণ করতে বারণ করা হয়েছে। তায়সালা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার রা.-কে বলতে শুনেছেন:

بكاء الوالدين من العقوق والكبائر

পিতা-মাতাকে কাঁদানো তাদের অবাধ্যচরণ ও কবীরা গুনাহসমূহের শামিল।[২৪]

০৪. অপরাধের আমলযোগ্যতা

আইনের ৬নং ধারায় উল্লিখিত অপরাধকে আমলযোগ্য (cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং আপোষযোগ্য (compoundable) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

- **সীমাবদ্ধতা**
  - **নমনীয়তা**

আইনের ৬নং ধারায় উক্ত অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতার বিষয়ে বলা হয়েছে। এ আইনের অধীন অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) ও আপোষযোগ্য (compoundable) হবে। এতে লক্ষণীয় যে, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের বিষয়টি নমনীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো কিছুটা কঠোরতা আরোপ করা প্রয়োজন ছিল।

০৫. অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ ও বিচার

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার কার্য পরিচালনার বিষয়ে ৭নং ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে code of criminal procedure 1898 (act

---

২৩. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* অনুচ্ছেদ: উকুবাতি উকূকিল ওয়ালিদাইন, হাদীস নং-২৯, পৃ. ৪৩

২৪. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* অনুচ্ছেদ: বুকা-ইল ওয়ালিদাইন, হাদীস নং-৩১, পৃ. ৪৩

of 1898) এ যা কিছু থাকুক না কেন এ আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারযোগ্য হবে। একই ধারার ২নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, এ আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট সন্তানের পিতা বা মাতার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত তা আমলে গ্রহণ করবে না।[২৫]

- **সীমাবদ্ধতা**
  - **অপরাধ আমলে নেয়া ও বিচার**

আইনের ৭নং ধারার ২নং উপধারায় বলা হয়েছে, কোন আদালত এ আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট সন্তানের পিতা বা মাতার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত আমলে গ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ আইনী প্রতিকারের জন্য লিখিত অভিযোগের শর্তারোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণের অধিকাংশ পিতা-মাতা তা নীরবে সহ্য করেন বা মনোঃকষ্ট নিয়ে জীবন অতিবিহিত করেন। লিখিত অভিযোগ দায়ের করে আইনী প্রতিকার পাওয়ার মানসিকতা অধিকাংশ পিতা-মাতার থাকে না। সেক্ষেত্রে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের যেসব কর্মী বাড়িবাড়ি গিয়ে মাতৃ ও শিশুদের খোঁজ খরব নেন, তাদেরকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিজস্ব এলাকার প্রধানদের অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন দেয়ার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তা হলে সরকারের কাছে অতি সহজেই প্রবীণদের সাবিক অবস্থার একটা রিপোর্ট সংগৃহীত হবে এবং সে মতে পদক্ষেপ ও প্রতিকার বিধান করতে সুবিধা হবে। তা ছাড়া ইউনিয়ন, পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার ও কাউন্সিলরদের এই দায়িত্বে নিয়োজিত করা যেতে পারে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে পারে।

০৬. আপোষ নিষ্পত্তি

আলোচ্য আইনে বিষয়টি আপোষ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনের ৮নং ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে, এ আইনের অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ আপোষ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বার কিংবা ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর কিংবা অন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট আদালত প্রেরণ করতে পারবে। ৮নং ধারার ২ উপধারায় বলা হয়েছে, উক্ত আইনের অধীন কোন অভিযোগ আপোষ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরিত হলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান, মেয়র, মেম্বার বা কাউন্সিলর উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ প্রদান করবেন এবং বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন এবং এরূপ নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি

---

[২৫] '*পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন*, ২০১৩, ধারা-৭

হয়েছে বলে গণ্য হবে।[২৬] ৯নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকারি গেজেটের মাধ্যমে এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

- **সীমাবদ্ধতা**

➢ **আপোষ ও নিস্পত্তি**

আইনের ৮নং ধারার ১ নং উপধারায় উক্ত বিষয়ে অভিযোগ আপোষ নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বার কিংবা ক্ষেত্রমত সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর অথবা অন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে চেয়ারম্যান, মেম্বার, মেয়র বা কাউন্সিলর একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলেও 'অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি'র বিষয়টি স্পষ্ট নয়। গ্রামের মোড়ল বা মাতব্বরগণ অনেক সময় গ্রামের সালিশ পরিচালনা করে থাকেন; কিন্তু তাদের যোগ্যতা, জ্ঞান, নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া যায়। পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করলে তারা কতটুকু সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নিস্পত্তি করতে পারবেন তা নিশ্চিত নয়। তা ছাড়া আইনের ২নং উপধারায় বলা হয়েছে, কোন অভিযোগ আপোষ নিস্পত্তির জন্য প্রেরিত হলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান, মেয়র, মেম্বার বা কাউন্সিলর উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিয়ে তা নিস্পত্তি করবেন, যা আদালত কর্তৃক নিস্পত্তিকৃত বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে আদালতের সমপর্যায়ের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

ইসলামের বিধানে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পর 'উলিল আমর'-এর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং তাদের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
>
> হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক থেকে উত্তম।[২৭]

'উলিল আমর' এর ব্যাখ্যা : উলিল-আমর' আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই

---

২৬. '*পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন*, ২০১৩, ধারা-৮

২৭. আল-কুরআন, ৪ : ৫৯

ইবনে আব্বাস রা., মুজাহিদ ও হাসান বসরী রহ. প্রমুখ মুফাসসিরগণ আলিম ও ফকীহ্ সম্প্রদায়কে 'উলিল-আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের হাতেই দীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত। মুফাসসিরীনের অপর একদল, যাদের মধ্যে আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামও রয়েছেন, তারা বলেছেন যে, 'উলিল-আমর'-এর অর্থ হচ্ছে, সে সমস্ত লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। এছাড়া তফসীরে ইবনে কাসীর এবং তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (আলিম ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।[২৮]

মাতা পিতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ পর্যালোচনায় বলা যায়, সন্তান ও পিতা-মাতার সম্পর্ক খুবই আন্তরিক ও গভীর। ধর্মীয় দিক থেকে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ-এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আইনী প্রতিকারের মাধ্যমে শ্রদ্ধাবোধ, মর্যাদা ও সদাচরণ আদায় করার দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। মূলত পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক এমন নয় যে, পিতা-মাতা তার ভরণ-পোষণ ও সদাচরণ প্রাপ্তি মামলা বা অভিযোগ দাখিল করে তা সন্তানের নিকট থেকে আদায় করবেন। বিষয়টি যতটুকু না আইনী তার চেয়ে অনেক বেশি নৈতিক ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত। বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে এমন আইন ছিল না। বর্তমানে সমাজের অবক্ষয়, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের স্খলনের ফলে এ জাতীয় বিষয়ে আইন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। সমাজের সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলন ও চর্চা, নৈতিকতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধসহ উন্নত চরিত্র বিরাজমান থাকলে এ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হতো না। তাই পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা, তাদের প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব এবং এর ইহকালীন ও পরকালীন প্রতিদান ও শাস্তি এবং সার্বিক মূল্যায়ন সমাজের প্রত্যেক স্তরে বিকাশের প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি আইনটিকে আরো গঠনমূলক ও কার্যকর করার মাধ্যমে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা সম্ভব।

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের গুরুত্ব

আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতি পবিত্র কুরআনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পিতা-মাতার মাধ্যমেই মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে, এ কারণে সন্তানের জীবনে পিতা-মাতার অবদান অতুলনীয়। হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক আদায়ের পর বান্দার হকের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বান্দার হকের মধ্যে পিতা-মাতার হক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার মর্যাদা অনেক উচু, যা পবিত্র

---

২৮. 'মুফতী মুহাম্মদ শাফী', *তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন*, পৃ. ২৬০

কুরআনের বর্ণনা থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কেননা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর অধিকারের পাশাপাশি পিতা-মাতার অধিকারের বিষয়ে বলা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা ও সদাচরণের বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

আল্লাহর পর পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণ-এর নির্দেশ

পিতা-মাতার প্রতি আচরণ ও ব্যবহার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

> وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
>
> তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন তোমরা তাঁর ইবাদাত ছাড়া অন্য কারোর ইবাদাত কর না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে "উহ্" পর্যন্তও বল না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিও না বরং তাদের সাথে সম্মান ও মর্যাদার সাথে কথা বল। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাক এবং দু'আ করতে থাকো এই বলে, "হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেমন তারা (দয়া, মায়া, মমতা সহকারে) শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[২৯]

আলকুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াত দুটি থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়:

প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায়ের পর মানুষের উপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা। কেননা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্র একত্বের পর সর্বপ্রথম নির্দেশেই পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার-এর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পিতা-মাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন তাদের মেজাজ কিছুটা খিটখিটে হয়ে যেতে পারে এবং বয়সের কারণে তাদের আচরণে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে থাকলে তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা। তাদের কথা খুশীমনে মেনে নেয়া। তাদের কোন কথায় বিরক্ত হয়ে জবাবে উহ্ শব্দটি উচ্চারণ না করা অথবা তাদের সাথে এমন আচরণ না করা যাতে তারা উহ্ শব্দটি উচ্চারণ করেন। ধমকের সুরে বা উচু কণ্ঠে বা কর্কশ ভাষায় তাদের সাথে কথা না বলা। আমাদের শৈশবকালের কথা স্মরণ করা যে, তারা আমাদের প্রতি কীরূপ অনুগ্রহ করেছেন।

---

২৯. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩-২৪

তৃতীয়ত: পিতা-মাতার মান সম্মানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। কথা বলার সময় তাদের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা। বয়সের শেষ পর্যায়ে এসে যখন তারা দুর্বল হয়ে পড়েন তখন তাদের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া। বয়সের কারণে তাদের মান অভিমান অনুধাবন করা এবং বিরক্ত হয়ে তাদের সম্মুখে এমন কথা না বলা যা তাদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

চতুর্থত: আচার আচরণ ও ব্যবহারে তাদের সাথে বিনয়ী ও কোমল স্বভাবের আচরণ প্রকাশ করতে হবে। আনুগত্যের সাথে মাথা অবনত রাখা, তাদের নির্দেশ মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করা এবং পালন করা। বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের খেদমতে নিয়োজিত থাকা; কিন্তু এক্ষেত্রে বিরক্তি, অহমিকা বা অনুগ্রহ প্রকাশ না পাওয়া উচিত। কেননা এ রকম সেবা ও পরিচর্যা আমাদের নিকট তাঁদের প্রাপ্য। তাঁদের সেবা ও পরিচর্যা করার সুযোগ লাভে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ - وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ -

আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থাপন করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।[৩০]

উপরোক্ত আয়াতের বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে সন্তানের জন্য মায়ের কষ্টের বর্ণনা, বিশেষ করে তাকে কত কষ্টে তার মা গর্ভে ধারণ করেছেন তার বর্ণনা, সন্তানের প্রতি মায়ের অনুগ্রহ, সন্তানকে দুধ পান করানো ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতে 'আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও' দ্বারা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতার পরপরই পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ পায় এমন

---

৩০. আল-কুরআন, ৩৯ : ১৪-১৫

কোন নির্দেশ পিতা-মাতা প্রদান করলে তার আনুগত্য করা যাবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে সহঅবস্থানের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত প্রতিটি কাজের মধ্যেই সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমেই তার নৈকট্য অর্জন করা যায়। এত সব আমলের মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকে রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল বলে ঘোষণা করেছেন,

> عن عبد الله قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم اى العمل احب الى الله عز و جل قال الصلاة على وقتها قلت ثم اى قال ثم الجهاد فى سبيل الله قال حدثنى بهن ولو استزدته لزادنى-
>
> আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি নবী স. কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বলেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদাচার। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে এসব বিষয়ে বললেন। আমি আরো জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন।[৩১]

পিতা-মাতার সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ

পিতা-মাতার সাথে কোমল ব্যবহার এবং নম্র ভাষায় বিনয়ী হয়ে কথা বলার নির্দেশ দেওয়ার কারণ হলো, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে তারা অনেক সময় স্বাভাবিক আচরণ নাও করতে পারেন। তখন তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যেতে পারে বা কোন বিষয়ে অধৈর্য হয়ে পড়তে পারেন। সেই অবস্থায়ও সন্তানকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং কোমল ভাষায় কথা বলতে হবে।

তায়সালা ইবনে মায়্যাস রহ. বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি, যা আমার মতে কবীরা গুনাহ্‌র শামিল। আমি তা ইবনে উমার রা.-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কী? আমি বললাম, এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি : (১) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, (২) নরহত্যা, (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন, (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যা অপবাদ রটানো, (৫) সুদ খাওয়া, (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা, (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা, (৯) সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে উমার রা. আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে ও জান্নাতে প্রবেশ

---

৩১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ* (অনুবাদ ও সম্পাদনা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, ঢাকা), অধ্যায়ঃ শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদঃ আল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ৫৪৩২, খ. ৯, পৃ. ৩৮৯; ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১, পৃ. ৩৩

করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে ও ভরণ-পোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি করীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো।[৩২]

পিতা-মাতার দুআ কবুল হয়

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতস্বরূপ। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ কবুল হয়। তাই তাদের দু'আ নিতে হবে এবং বদদু'আ থেকে বাঁচতে হবে। বদদু'আ থেকে বাঁচার উপায় হলো তাদের প্রতি অসদাচরণ না করা। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন:

> ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر و دعوة الوالدين علي والدهما
>
> তিনটি দু'আ অবশ্যই কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। (১) মজলুম বা নির্যাতিতের দু'আ, (২) মুসাফিরের দু'আ এবং (৩) সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ।[৩৩]

মৃত্যুর পরেও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি আচরণকে এতই গুরুত্ব প্রদান করেছে যে, তাদের মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তা হলো, তাদের জন্য দু'আ করা, তাদের বৈধ ওসিয়ত পূর্ণ করা, তাদের বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের দিক থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এমন আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

উসাইদ রা. বলেন, আমরা নবী স.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন: হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দু'আ

---

৩২. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ: পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৮, পৃ. ৩৫

حدثنى طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فاصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبائر فذكرت ذالك الابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الاشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف و قذف المحصنة واكل الربا و اكل مال اليتيم والحاد في المسجد والذى يستسخر و بكاء الوالدين من العقوق قال لى ابن عمر اتفرق من النار وتحب ان تدخل الجنة قلت اى والله قال احى والداك قلت عندى امى قال فوالله لو النت لها الكلام واطعمتها الطعام لتخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر-

৩৩. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ: দা'ওয়াতিল ওয়ালিদাইন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩২, পৃ. ৪৪

করা, (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয়।[৩৪]

ও.আই.সি সম্মেলনের ঘোষণা

ও.আই.সি-এর উদ্যোগে ১৯৯০ সালের ৩১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী ও.আই.সি.ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন মিসরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সর্বশেষ দিন ৫ আগস্ট "The Cairo Declaration Of Human Rights In Islam" সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়। উক্ত ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ৭ এ সন্তান ও পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Article-7:

(a) As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, society and the state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both the fetus and the mother must be protected and accorded special care.

(b) Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education they desire for their children, provided they take into consideration the interest and furure of the childred in accordance with ethical values and the principles of the shariah.

(c) Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the shariah.[35]

---

৩৪. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদঃ বিররিল ওয়ালিদাইনি বা'দা মাওতিহিমা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৫, পৃ. ৪৬

عن اسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقى من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدها وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك الا من قبلها

৩৫. *The Cairo Declaration of Human Rights in Islam*, Organized by OIC (Organization of Islamic Cooperation) in the Nineteenth Islamic

অনুচ্ছেদ: ৭

(ক) জন্ম গ্রহণের প্রাক্কালে, প্রত্যেক শিশুর তার পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ হতে যথাযথ পরিচর্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত যত্ন এবং নৈতিক তত্ত্বাবধান পাবার অধিকার রয়েছে। ভ্রূণ এবং মা অবশ্যই সুরক্ষিত এবং বিশেষ যত্নে থাকবে।

(খ) পিতা-মাতার বা দায়িত্বপ্রাপ্তদের অধিকার রয়েছে যে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী সন্তানকে শিক্ষা প্রদান এবং ভবিষ্যতের জন্য গঠন করা নৈতিক মূল্যবোধ এবং শরী'আহ্-এর মূলনীতির আলোকে।

(গ) পিতা-মাতা উভয়ই সন্তান-এর নিকট হতে অনুরূপ অধিকার রয়েছে এবং আত্মীয়দেরও তাদের পরস্পরের নিকট হতে শরী'আহ্-এর আলোকে অধিকার রয়েছে।

ও.আই.সি.-ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে শিশুদের অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে এবং সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার জন্যও অনুরূপ অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শিশুদের জন্য অধিকার রয়েছে তার পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট হতে, অনুরূপভাবে পিতা-মাতার জন্যও তাদের নিকট হতে অধিকার রয়েছে।

'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩'-এর বিষয়ে সুপারিশ ও প্রস্তাবনা

এক. পৃথক কারাদণ্ডের বিধান অন্তর্ভুক্ত করণ : কেননা বিদ্যমান আইনে শুধু আর্থিক দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ৬ মাস বা ১ বছর কারাদণ্ড অথবা আর্থিক দণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আইনের ৫নং ধারার (১) উপধারায় "উক্ত অপরাধের জন্য ছয় মাস থেকে এক বছরের কারাদণ্ড বা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে" সংযুক্ত করা যেতে পারে।

দুই. শিরোনামে সদাচরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ: পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইনটির শিরোনাম "পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ ও সদাচরণ আইন" করা যেতে পারে, সদাচরণ এর সংজ্ঞায় "শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান প্রদর্শন, আনুগত্য করা, শারীরিক ও মানসিকভাবে কষ্ট না দেওয়া, উচ্চ স্বরে ও কর্কশ ভাষায় কথা না বলা, যে কোন কথা বা কাজ দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কষ্ট না দেওয়া, তাদের প্রতি অবহেলা না করা"-কে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

Conference of Foreign Ministers, held in Cairo, Arab Republic of Egypt, From 9-14 Muharram 1411/31 July to 5 August 1990

তিন. বিদ্যমান আইনের ৩নং ধারার ৪নং উপধারা এর সাথে নিম্নোক্তভাবে সংযুক্ত করা যেতে পারে, ৩ (৪) "অথবা কোন সন্তান তার পিতা-মাতার প্রতি এমন আচরণ করবে না, যাতে পিতা বা মাতা বা উভয়ে স্বেচ্ছায় সন্তানের বাসস্থান থেকে আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য হন।"

চার. 'যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ'-এর ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্তকরণ : বিদ্যমান আইনের ৩ নং ধারায় ৭নং উপধারায় বর্ণিত "সন্তান তার মাসিক আয় বা বাৎসরিক আয় হইতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পিতা বা মাতা বা উভয়কে প্রদান করবে" এর সাথে অন্য একটি উপধারা যুক্ত করে 'যুক্তিসঙ্গত' পরিমাণ অর্থ এর ব্যাখ্যা দেয়া যায় এভাবে যে, "যা দ্বারা তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা ব্যয় বহনের ন্যূনতম অর্থ সংকুলান হয়"।

পাঁচ. সন্তানহীন পিতা-মাতার দায়িত্ব গ্রহণ : যে সকল পিতা-মাতার সন্তান নেই বা সন্তানের কর্মসংস্থান নেই বা সন্তান আয় রোজগার করতে অক্ষম বা বিকলাঙ্গ তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ করার জন্য বিধি প্রণয়ন করা।

ছয়. শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ: সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরের পাঠ্যসূচিতে পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব, নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণের ধর্মীয় নির্দেশনা, পরকালীন জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং উল্লিখিত বিষয়সমূহ সরকারের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও বেসরকারি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সাত. কঠোরতা আরোপ: বিদ্যমান আইনের ৬নং ধারার আমলযোগ্যতা, জামিন যোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতার ক্ষেত্রে নমনীয়তা পরিহার করে আরো কঠোরতা আরোপ করা এবং বিচারিক আদালতের পরিধি ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সীমাবদ্ধ না রেখে এর পরিধি বৃদ্ধি করা।

আট. সহায়ক আইন প্রণয়ন: বিদ্যমান আইনের ৩নং ধারার উপধারা (৩) এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর সহায়ক আইন প্রণয়ন করা। যথা: সরকারি স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারি কর্মক্ষেত্রসমূহের কর্মরতদের মধ্যে ক্ষেত্র অনুযায়ী তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস বা চিকিৎসার সুবিধার্থে তাদের অনুকূল বিভাগ, জেলা, থানা বা কর্মস্থলে পদায়ন (posting)-এর বিধি প্রণয়ন করা।

উপসংহার

সন্তানের জন্য পিতা-মাতা হলেন আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সন্তানের লালনপালন ও তাদেরকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা, বিনয়ী আচরণ ও তাদের জন্য ব্যয় করার বিষয়ে ইসলামে দিক নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষভাবে বৃদ্ধ বয়সে তাদের প্রতি ভালো আচরণ, সেবা-যত্ন, সময় দান করা এবং আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য দু'আ করার শিক্ষা ইসলাম প্রদান করেছে। তবে ইসলাম তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য আইন নির্দিষ্ট করে দেয়নি। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে প্রয়োজন অনুযায়ী পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ বাস্তবায়নের জন্য শরী'আহ্সম্মত পদ্ধতিতে কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে বিধান প্রণয়ন করতে পারবে। ইসলামে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ যতটা না আইনগত তার চেয়ে বেশি নৈতিক ও ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধ-এর সাথে সম্পৃক্ত। মৌলিক অবক্ষয়ে জর্জরিত ও নৈতিক স্খলনে পতিত কোন সমাজে আইন দিয়ে নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলন ও সামাজিক সচেতনতা। তাই আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের নৈতিক, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতার অনুশীলন প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে বিষয়টি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তকরণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা খুবই জরুরী। পাশাপাশি এ বিষয়ে আইনটি আরো সময়োপযোগী ও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তাহলেই সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত হবে, র্নিবিঘ্ন হবে তাদের অধিকার প্রাপ্তি।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন ২০১৬

প্রাণী হত্যা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

এম. হুমায়ুন কবির খালভী*

Killing Animal: Islamic Perspective

ABSTRACT

Allah has created innumerable number of animals and creatures on earth. They are always busy with praising Allah and serving mankind. They play a great role in keeping environmental balance. Considering all these, Islam has declared detailed rules and regulations about animal. The Holy Quran and the Sunnah have set their rights. However, differences exist in rules about animals based on differences in nature and characteristics of animals. Based on nature and characteristics, such rules contain some actions related to animals which are simply allowed in Islam, while some are mandatory, some are makruh (i.e. not liked) and some are forbidden (unlawful), etcetera. The main objective of this article is to analyze and describe rights of animals and related rules in Islam. This article has been prepared following descriptive method of presentation. It describes identity of animals, their rights, kind of animals which is permitted to kill/slaughter and the kind which is not permitted, killing of demon, rule on mistakenly killing of animals, etcetera. The study proves that the rules of Islam in establishing animal's rights are quite logical. In one side, Islam prohibits creating any trouble to animals and determined rules and regulations for animal husbandry, while, on the other hand, considering the public interest it allows killing of some others.

Keywords: animal; killing; rights; *halal*; harmful.

---

* প্রভাষক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এগুলো সর্বদা তাঁর প্রশংসায় এবং পাশাপাশি মানুষের সেবায় নিয়োজিত। পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাণীর ভূমিকা অপরিসীম। এ সব দিক বিবেচনায় ইসলাম প্রাণী সম্পর্কে যথাযথ বিধি-বিধান দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ প্রাণীর বিভিন্ন অধিকার ও প্রাপ্য নির্ধারণ করেছে। প্রাণীর শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্য ভেদে এ সম্পর্কিত বিধানেও ভিন্নতা রয়েছে। ক্ষেত্র অনুযায়ী বিধানগুলোর কোনোটি প্রাণী সম্পর্কিত আচরণকে বৈধ, কোনোটিকে ফরয অথবা মাকরূহ বা হারাম ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাণীদের অধিকার ও এ সংক্রান্ত বিধিবিধান বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধটি রচনার মূল উদ্দেশ্য। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে রচিত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রাণী পরিচিতি, অধিকার, কোন্ প্রাণী হত্যা করা বৈধ ও কোন্‌টি নিষিদ্ধ, জিন হত্যা করা, ভুলক্রমে প্রাণী হত্যা ইত্যাদির বিধান তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলাম প্রাণীর অধিকার এবং এ সম্পর্কিত যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। একদিকে ইসলাম প্রাণীকে কষ্ট দেয়া নিষিদ্ধ করে এদের প্রতিপালনের বিস্তারিত বিধান দিয়েছে, অন্যদিকে জনকল্যাণ বিবেচনায় কিছু প্রাণী হত্যা করার অনুমতিও দিয়েছে।

মূলশব্দঃ প্রাণী; হত্যা; অধিকার; হালাল; কষ্টদায়ক।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ অসংখ্য মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির অগণিত প্রাণীও রয়েছে। প্রত্যেক প্রাণের মালিক মহান রাব্বুল 'আলামীন। তিনিই তাদের রিযকের ব্যবস্থা করেন। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীই সৃষ্টির সেরা জাতি মানবের খিদমতে নিয়োজিত। তবে মহান আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণের মর্যাদা দিয়েছেন। কোনো প্রাণীকে হত্যা করার অন্যায় অধিকার তিনি কাউকে দেননি। এমনকি নিজের প্রাণও নিজে ধ্বংস করতে পারবে না। কারণ, প্রাণদাতা একমাত্র আল্লাহ। তাই তিনি প্রাণগ্রহীতাও। তিনি পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন, যাদের থেকে মানব সমাজ নানাভাবে উপকৃত হয়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ. ﴾

"তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু কল্যাণ রয়েছে এবং ওটা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো। আর যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে ওদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর আর

ওরা তোমাদের ভারবহণ করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেথায় প্রাণান্তকর ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না; তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (তিনি) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা (সৃষ্টি করেছেন), যাতে তোমরা আরোহণ করো, (এছাড়া তাতে) শোভা (বর্ধনের ব্যবস্থাও) রয়েছে। তিনি আরো এমন (অনেক ধরনের জন্তু-জানোয়ার) সৃষ্টি করেছেন, যার (পরিমাণ ও উপযোগিতা) সম্পর্কে তোমরা (এখনও পর্যন্ত) কিছুই জানো না।"[১]

তাই সাধারণভাবে যে কোন প্রাণীকেই হত্যা করা জায়িয নয়। তবে আহারের উদ্দেশ্যে আল্লাহর অনুমতিতে হালাল প্রাণী যবেহ করা বৈধ। তেমনি যে সকল প্রাণী হিংস্র ও কষ্টদায়ক, তাদেরকেও প্রয়োজনে হত্যা করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে অনেক মানুষের স্বচ্ছ ধারণা নেই। তারা অনর্থক প্রাণী হত্যা করে তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। তারা একে পাপও মনে করে না। তাই এ সম্পর্কে শরয়ী সচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, আমাদের সংবিধানেও প্রাণীদের নিরাপত্তা প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে-

"রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"[২]

তাই বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকার প্রাণী হত্যার কারণে প্রচলিত আইন মতে শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে।

প্রাণী পরিচিতি

প্রাণী বলতে যে জীবের প্রাণ আছে, যা যমীনে চলাফেরা করতে পারে; জীবনযুক্ত সচেতন জীব।

ড. সা'দী আবূ হাবীব বলেন:

الحيوان: كل ذي روح: ناطقا كان أو غير ناطق.

"প্রাণী হলো প্রত্যেক প্রাণসম্বলিত জীব, সে কথা বলতে সক্ষম হোক বা না হোক।"[৩]

ইব্নুল মুযাফফর [২৬৮-৩৭৯হি.] বলেন:

الْحَيَوانُ كلُّ ذِي رُوحٍ "প্রাণী হলো প্রত্যেক প্রাণসম্বলিত জীব।"[৪]

---

১. আল-কুরআন, ১৬ : ৫-৮

২. বাংলাদেশ সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৬

৩. ড. সা'দী আবু হাবিব, *আল কামূসুল ফিকহী* (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৮৮খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০৯

৪. আবু মনসুর আল-আযহারী, *তাহযীবুল লুগাত* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৮৭

মুহাম্মদ আল-খাওয়ারিযমী [মৃ. ৩৮৭ হি.], বলেন:

الحيوان هو كل جسم حي.

"প্রাণী হলো প্রত্যেক জীবনযুক্ত দেহ।"[৫]

এক কথায়, যার প্রাণ আছে, নড়াচড়া ও যমীনে চলাফেরা করতে পারে তাদেরকে প্রাণী বলা হয়।

প্রাণীর অধিকার

প্রাণীর বিভিন্ন অধিকার কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.﴾

"ভূ-পৃষ্ঠে চলমান প্রতিটি জীব এবং বায়ুমণ্ডলে দু'ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখিই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি। আমি কিতাবে কোনো বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি, অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে"।[৬]

নিম্নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো তুলে ধরা হলো:

১. ঘাস খাওয়ানো

অধীনস্থ প্রাণীদেরকে আহার করাতে হবে। তাদের জন্য ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘাস তাদের উপযুক্ত খাবার। তাই তাদের জন্য মহান আল্লাহ মাড়ির দাঁত দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.﴾

"বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, তৎপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় যমীনের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে; এমন কি, যখন সেই যমীন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণ রূপ ধারণ করলো এবং তা শোভনীয় হয়ে উঠলো, আর ওর মালিকরা মনে করলো যে, তারা এখন ওর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন দিবাকালে অথবা রাত্রিকালে ওর উপর আমার পক্ষ থেকে কোনো আপদ এসে পড়লো, সুতরাং আমি ওকে এমন

---

৫. মুহাম্মদ আল-খাওয়ারিযমী, *মাফাতীহুল উলূম* (দারুল কিতাবিল আরাবী, তাবি.), খ. ১, পৃ. ৬১

৬. আল কুরআন, ৬ : ৩৮

নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকল্য ওর অস্তিত্বই ছিল না, এরূপেই নিদর্শনাবলিকে আমি বিশদরূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্যে যারা ভেবে দেখে।"[৭]

২. বন্দী করে রাখা নিষিদ্ধ

বন্দী করে ক্ষুধার্তাবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা হারাম। হিশাম ইবন যায়েদ ইবন আনাস ইবন মালিক বলেন:

دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِك دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ».

"আমি আমার দাদা আনাস ইবন মালিকের সাথে হাকাম ইবন আইয়ুবের বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম, কিছু লোক একটি মুরগীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছে। তখন আনাস রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ স. প্রাণীদেরকে বন্দী করে আটকে রাখতে নিষেধ করেছেন"।[৮]

আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

عُذِّبَت امْرَأَةٌ فِي هِرَّة حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ لاَ أَنْت أَطْعَمْتِهَا، وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا ، وَلاَ أَنْت أَرْسَلْتِيهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.

"জনৈকা মহিলাকে এক বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। সে তাকে বন্দী করে রেখেছিল, অবশেষে সে ক্ষুধায় মারা যায়। এ কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো। রাবী বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ভালোই জানেন যে, বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না তুমি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে, তাহলে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকতো।"[৯]

৩. সাধ্যের বাইরে কষ্ট না দেয়া

প্রাণীদেরকে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য মতে কাজে ব্যবহার করতে হবে। যদি বেশি কাজ নিতে হয় তাহলে তাকে বেশি খাবার দিতে হবে। আবদুল্লাহ ইবন জাফর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন:

أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ يَوْم خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لاَ أُخْبِرُ بِه أَحَدًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِه هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ،

---

৭ আল-কুরআন, ১০ : ২৪

৮ মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আল মুসনাদ আস সহীহ* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা বি.), (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ), খ. ৩, পৃ. ১৫৪৯, হাদীস নং ১৯৫৬

৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল বুখারী, *আল জামি আস সহীহ*, (কায়রোঃ দারুশ শু'আব, ১৪০৭ হি, ১৯৮৭খ্রি.), পরিচ্ছেদ : (فضل سقي الماء), খ. ৩, পৃ. ১৪৭, হাদীস নং ২৩৬৫

فَدَخَلَ يَوْمًا حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الأَنْصَارِ، فَإِذَا جَمَلٌ قَدْ أَتَاهُ فَجَرْجَرَ، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ قَالَ بَهْزٌ، وَعَفَّانُ : فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ، فَسَكَنَ، فَقَالَ : مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ؟ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ : هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : أَمَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَهَا اللَّهُ، إِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ.

"আমাকে রাসূলুল্লাহ স. একদিন তার পেছনে বসালেন, তখন তিনি আমাকে একটি কথা গোপনে বললেন, যা আমি কাউকে যেন খবর না দিই। রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার সময় তার প্রিয় আড়াল ছিল কোনো বালির স্তুপ বা খেজুর গাছের প্রাচীর। তিনি একদিন এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে একটি উট পেলেন, যে তার কাছে এসে অভিযোগ করল আর তার চক্ষুদয় অশ্রু প্রবাহিত করল। বাহ্য ও আফফান বলল, যখন নবী স. তাকে ক্রন্দন করতে ও চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্রবাহিত করতে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ স. তার নিতম্ব ও পশ্চাৎদিক মাস্হ করতে লাগলেন। তখন সে প্রশান্ত হলো আর তিনি বললেন, এই উটের মালিক কে? তখন আনসারের এক যুবক এসে বলল, এটা আমার, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, তুমি কি এই জানোয়ারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন সে অভিযোগ করছে, তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রেখে মেহনত করাও"।[১০]

৪. গালি না দেয়া

প্রাণীদেরকে গালি দেয়া যাবে না। যায়েদ ইবন খালিদ আলজুহানী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلاَةِ.

"তোমরা মোরগকে গালি দিওনা। কেননা, সে তোমাদেরকে সালাতের দিকে আহ্বান করে"।[১১]

৫. খেলনার বস্তুতে পরিণত না করা

অনর্থক তাদের নিয়ে খেলা করা নিষিদ্ধ। সায়ীদ ইবনে জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا، وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللهُ، مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

---

১০. আহমদ ইবন হাম্বাল, *আল মুসনাদ*, তাহকিক: আবুল মু'আতী নূরী (বৈরূত: আলামুল কুতুব, ১৪১৯হি; ১৯৯৮খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৪, হাদীস নং ১৭৪৫

১১. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯২, হাদীস নং ২২০১৯

"একবার ইবন উমর রা. কুরাইশের এক যুবকদলের পাশ দিয়ে গমন করলেন। তারা একটি পাখিকে লক্ষ্য বানিয়ে তীর নিক্ষেপ করছে। তারা তাদের ভুল নিক্ষেপিত তীরের মালিকানা পাখির মালিকের জন্য ঘোষণা করে। যখন তারা ইবন উমরকে দেখল, তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন ইবন উমর রা. বললেন, এই কাজ কে করেছে? তাদের উপর আল্লাহর লা'নত। এই কাজ কে করেছে? নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ স. লা'নত করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে কোনো প্রাণীকে তীরের লক্ষ্য বানিয়েছে"।[১২]

৬. বিনা প্রয়োজনে হত্যা না করা

যে কোনো প্রাণী বিনা প্রয়োজনে হত্যা করা নিষিদ্ধ। হযরত আমর ইবন শারীদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ : يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ.

"যে ব্যক্তি অযথা কোনো চড়ুই পাখি হত্যা করবে, সে কিয়ামতের দিন ক্রন্দন করে বলবে, হে রব! নিশ্চয় অমুখ আমাকে অযথা হত্যা করেছে আর আমাকে কোনো কল্যাণে হত্যা করেনি"।[১৩]

৭. তাদের সামনে ছুরিতে শান না দেয়া

প্রাণী যেন মানসিকভাবে কষ্ট না পায়, তাই তাদের সামনে ছুরিতে শান দেয়া সমীচীন নয়। ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، فَقَالَ: «أَفَلَا قَبْلَ هَذَا تُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ.

"(একবার) রাসূলুল্লাহ স. এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে ছাগলের পিঠে পা রেখে ছুরিতে ধার দিচ্ছে এবং ছাগল তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তা আগেভাগে কেন করলে না? তুমি তো তাকে দুবার মারতে চাচ্ছ"।[১৪]

৮. হত্যার ক্ষেত্রেও সদয় হওয়া

প্রয়োজনে যখন প্রাণী যবেহ করবে, তখন তাতে সদয় হওয়া জরুরী। হযরত শাদ্দাদ ইবন আউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

---

[১২] মুসলিম, *আস-সাহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৫৫০, হাদীস নং ১৯৫৮

[১৩] আহমদ, *মুসনাদ*, খ. ৪, পৃ. ৩৮৯, হাদীস নং ১৯৬৯৯; আবু আব্দুর রহমান আহমদ নাসাঈ, *আস সুনানুল কুবরা* (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৪২১হি/২০০১খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৭৫, হাদীস নং ৪৪৫৮

[১৪] আবুল কাসেম সুলাইমান তাবরানী, *আল মুজামুল আওসাত* (কায়রো: দারুল হারামাইন, তা বি.), খ. ৪, পৃ. ৫৩, হাদীস নং ৩৫৭০

ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

"দুটি বিষয় আমি রাসূলুল্লাহ্ স. থেকে স্মরণ রেখেছি। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে সুন্দরভাবে হত্যা কর আর যখন যবেহ্ করবে সুন্দরভাবে যবেহ্ কর আর তোমরা তোমাদের ছুরিতে শান দেবে, যাতে জন্তুকে আরাম দিতে পারো"।[১৫]

৯. উপযোগী খিদমত গ্রহণ করা

যে প্রাণী যে কাজের উপযোগী তাকে সে কাজে ব্যবহার করা উচিত। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ স. কে বলতে শুনেছি:

بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي وَبَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

একবার এক রাখাল তার বকরির পালের কাছে ছিল। এমতাবস্থায় একটি নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে পাল থেকে একটি বকরি নিয়ে গেল। রাখাল নেকড়ে বাঘের পেছনে ধাওয়া করে বকরিটি তার নিকট থেকে ফিরে পেতে চাইল। তখন বাঘটি তার দিকে ফিরে বলল, (তুমি বকরিটি ফিরে পেতে চাও?) হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন তাকে কে রক্ষা করবে, যেদিন তার জন্য আমি ব্যতীত কোনো রাখাল থাকবে না? একবার এক ব্যক্তি একটি গাভির পিঠে বোঝা তুলে দিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভিটি তার দিকে ফিরে বলল, আমাকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; আমাকে কৃষিকাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথা শুনে লোকেরা বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল, সুবহানাল্লাহ! (কী আশ্চর্য, নেকড়ে কথা বলে! গাভী কথা বলে!) রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন, আমি, আবূ বক্‌র ও 'উমর এ কথা বিশ্বাস করি।"[১৬]

১০. তাদের বিপদে সাহায্য করা

প্রাণীরা যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন তাকে সাহায্য করা উচিত। তাতেও পুণ্য রয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন:

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.

---

১৫. মুসলিম, *আস-সহীহ,* (بَابُ الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ), প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৪৮, হাদীস নং ১৯৫৫

১৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* পরিচ্ছেদ: (مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ), খ. ৫, পৃ. ৬, হাদীস নং ৩৬৬৩

"একবার এক কুকুর একটি কূপের চতুষ্পার্শ্বে এভাবে ঘুরছিল যে, (মনে হয় যেন) সে এখনই মারা যাবে। এমন সময় বনী ইসরা'ঈলের জনৈকা ব্যভিচারিণী কুকুরটি দেখল এবং সে তার মোজা খুলে (পানি তুলে) তাকে পান করাল এবং এ কারণে তাকে ক্ষমা করা হলো"।[১৭]

ইসলামে প্রাণী হত্যার বিধান

বিনা প্রয়োজনে ইসলামে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ। ইসলাম মানব কল্যাণের জন্য প্রাণী হত্যা বৈধ মনে করে। শুধু ইসলাম নয় বরং পূর্ববর্তী সকল ধর্মে তা বৈধ ছিল। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِي رُوحٍ إلا أنْ يُؤْذِيَ.

"রাসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক প্রাণী হত্যা করা থেকে নিষেধ করেছেন; তবে সে কষ্ট দিলে ভিন্ন কথা।" [১৮]

হাদীসের বিশিষ্ট ভাষ্যকার বদরুদ্দীন আল-'আইনী রহ. বলেছেন:

وَالنَّهْي عَن قتل الْحَيَوَان إِمَّا لحُرْمَته كالآدمي، وَإِمَّا لتَحْرِيم أكله كالصرد، والهدهد، والضفدع لَيْسَ بمحرم فَكَانَ النَّهْي منصرفا إِلَى الْوَجْه الآخر.

"প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ হবার কারণ হয়তো প্রাণীটি মর্যাদাসম্পন্ন যেমন- মানুষ, অথবা তা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ যেমন- শ্রাইক ও হুদহুদ। ব্যাঙের ব্যাপারটি ভিন্ন। যদিও তা মর্যাদাসম্পন্ন নয়; তা নিষিদ্ধ হবার অন্য কারণ নিহিত রয়েছে।"[১৯]

যেসব প্রাণী হত্যা করা জায়িয নয়

কিছু প্রাণী রয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন কারণে হত্যা করা জায়িয নয়। নিম্নে তাদের তালিকা তুলে ধরা হলো:

১. ব্যাঙ

ব্যাঙ হত্যা করা মাকরূহ। কেননা, ব্যাঙ ইবরাহীম আ.-এর আগুন নিভাতে পেশাব করেছিল। তাই প্রিয় নবী স. একে এ মর্যাদা দিয়েছেন।

আবদুর রহমান ইবন উসমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَوَاءً يُجْعَلُ فِيهِ الضِّفْدَعُ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدِعِ.

---

১৭. বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২১১, হাদীস নং ৩৪৬৭

১৮. আবুল কাসেম সুলাইমান তাবরানী, *আল মু'জামুল কবির* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১১৬, হাদীস নং ১২৬৩৯

১৯. বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল কারী* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াতুস তুরাছিল আরবি, তা বি.), খ. ২১, পৃ. ১০৭

"(একবার) জনৈক ডাক্তার নবী স.-এর সামনে এমন ঔষধের কথা বললেন, যাতে ব্যাঙ ব্যবহৃত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ স. ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেন"।[২০]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لاَ تَقْتُلُوا الضِّفَادِعَ، فَإِنَّ نَقِيقَهَا الَّذِي تَسْمَعُونَ، تَسْبِيحٌ.

"তোমরা ব্যাঙ হত্যা করো না; কেননা, তার ডাক যা তোমরা শোনতে পাও তা তাসবীহ"।[২১]

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

كَانَتِ الضِّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا.

"ব্যাঙ ইবরাহীমের আগুন নিভানোর চেষ্টা করেছিল আর টিকটিকি তাতে ফুঁক দিয়েছিল, তাই ব্যাঙ হত্যা নিষেধ করা হয়েছে এবং টিকটিকি হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে।"[২২]

২. দংশন করে না এমন পিঁপড়া

পিঁপড়া হত্যা করা মাকরূহ।

আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী বলেন:

(ويكره قتل النملة، ما لم تبتدي بالأذى) لأن قتل الحيوان إنما يجوز لغرض صحيح، فإذا لم يؤذ: لا يقتل (بخلاف القملة) فإنه يجوز قتلها مطلقاً، سواء آذت أو لا، لأنها بالطبع مؤذية، وكذلك البراغيث.

"পিঁপড়া হত্যা করা মাকরূহ, যদি কষ্ট না দেয়। কেননা, প্রাণী হত্যা করা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই বৈধ। তাই যখন সে কষ্ট দিবে না, তাকে হত্যা করা হবে না। উকুনের ব্যাপারটি ভিন্ন। সে কষ্ট প্রদান করুক বা না করুক একে সর্বাবস্থায় হত্যা করা যাবে। কেননা, সে স্বভাবজাতভাবে কষ্টদায়ক। আটালির ব্যাপারটিও অনুরূপ।"[২৩]

৩. হুদহুদ

হুদহুদ হত্যা করা মাকরূহ। হুদহুদ কবুতরের মতো এক ধরনের পাখি। তার কাছ থেকে সুলাইমান আ. পানি তালাশের সহযোগিতা নিয়েছিলেন।[২৪]

---

২০. আবু বকর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবি শায়বা, *মুসান্নাফে ইব্‌ন আবি শায়বা* (বোম্বাই: তাবআতুত দারুস সলাফিয়্যা, তাবি), খ. ৭, পৃ. ৪৫০, হাদীস নং ২৪১৭৭

২১. ইব্‌ন আবি শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৭, পৃ. ৪৫০, হাদীস নং ২৪১৭৮

২২. আব্দুর রায্‌যাক, *আল মুসান্নাফ*, তাহকিক: হাবিবুর রহমান আযমী (হিন্দ: আল মজলিসুল ইলমী, ১৪০৩হি), খ-৪, পৃ. ৪৪৫, হাদীস নং ৮৩৯২

২৩. বদরুদ্দীন আইনী, *মিনহাতুস সুলূক ফি শরহি তুহফাতুল মুলূক* (কাতার: ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ২০০৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪২৫

২৪. আবু আব্দুর রহমান ফরাহিদী, *কিতাবুল আইন* (মাকতাবাতুল হিলাল), খ. ৩, পৃ. ৩৪৭

ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ.

"রাসূলুল্লাহ স. চারটি প্রাণী হত্যা থেকে নিষেধ করেছেন। এগুলো হলো, পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ ও শ্রাইক পাখি"।[২৫]

৪. শ্রাইক পাখি (الصُّرَدُ)

যা দেখতে দোয়েল পাখির মত। শ্রাইক পাখি হত্যা করা মাকরূহ।

৫. মৌমাছি

যাকে মধুপোকাও বলা হয়। তা হত্যা করা নিষেধ। যুহরী রা. বলেন:

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ وَالنَّحْلِ.

"নবী স. পিঁপড়া ও মৌমাছি হত্যা করতে নিষেধ করেন"।[২৬]

৬. বিড়াল

বিড়ালকে নবী স. আদর করতেন। তাকে আহার করাতেন। তাই তাকে হত্যা করা অনুচিত। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

عُذِّبَت امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"এক মহিলাকে বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সে তাকে বন্দী করে রাখে, ফলে তা মারা যায়। ফলে সে জাহান্নামী হয়েছে। সে যখন তাকে বন্দী করে রেখেছিল, তখন তাকে খেতেও দেয়নি, পান করতেও দেয়নি আর ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের কীটমূষিকাদী খেতে পারে"।[২৭]

৭. কুকুর

কিছু নির্দিষ্ট কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর হত্যা করা জায়িয নয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

---

২৫. আহমদ, *মুসনাদ*, খ. ১, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং ৩০৬৭

২৬. ইব্‌ন আবি শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৯, পৃ. ১১০, হাদীস নং ২৭১৮৮

২৭. মুসলিম, *আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদ: (تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ), খ. ৪, পৃ. ১৭৭০, হাদীস নং ২২৪২

"এক লোক রাস্তা দিয়ে চলছে এমন সময় তার প্রচণ্ড পিপাসা লাগল। তখন সে একটি কূপ পেল এবং তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর সে বের হয়ে এসে দেখল, একটি কুকুর হাফাচ্ছে এবং পিপাসার কারণে মাটি খাচ্ছে। তখন লোকটি বলল, নিশ্চয় এই কুকুরের আমার মত পিপাসা লেগেছে। তখন সে তাতে অবতরণ করল ও পানি দ্বারা তার মোজা ভর্তি করল, অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে উঠে গেল আর কুকুরকে পান করাল। তখন আল্লাহ তার শোকর আদায় করল ও তাকে ক্ষমা করল। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য এই প্রাণীদের ক্ষেত্রে কি পুণ্য রয়েছে? তখন তিনি বললেন, প্রত্যেক তাজা কলিজাতে পুণ্য রয়েছে"।[২৮]

আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ.

"যদি কুকুর একটি জাতি না হতো, তবে আমি তাদের সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। তাই তোমরা তাদের মাঝে নিকষ কালো কুকুরকে হত্যা কর"।[২৯]

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلاَّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ.

"রাসূলুল্লাহ স.-এর খুতবা দানের সময় যারা তাঁর চেহারা থেকে গাছের ডালগুলো সরিয়ে রাখতেন আমি তাদের একজন। তিনি বলেন, যদি কুকুর একটি জাতি না হত, তবে আমি তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিতাম। তাই তোমরা তাদের নিকষ কালো কুকুরকে হত্যা কর। আর যে কোনো পরিবার কুকুর লালন করবে, তাদের আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পুণ্য কমে যাবে। তবে শিকারের কুকুর, ক্ষেতের কুকুর ও ছাগল পাহারা দেয়ার কুকুর হলে ভিন্ন।"[৩০]

তিন প্রকার কুকুর হত্যা করা বৈধ:

১. পাগলা ককুর, যে মানুষের উপর হামলা করে;

---

[২৮] মুসলিম, *আস-সাহীহ,* পরিচ্ছেদ: (فَضْلِ سَاقِي الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا), খ. ৪, পৃ. ১৭৬১, হাদীস নং ২২৪৪

[২৯] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *আস সুনান,* তাহকীক: বাশ্শার (বৈরূত: দারুল গরবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৩০, হাদীস নং ১৪৮৪

[৩০] তিরমিযী, *আসসুনান,* খ. ৩, পৃ. ১৩২, হাদীস নং ১৪৮৯

২. বেওয়ারিশ কাল কুকুর। যার পুরো শরীর কাল। তাতে ভিন্ন কোনো রঙ নেই; ৩. যে কুকুর অন্য প্রাণীদের উপর হামলা চালায়। এই তিন প্রকার ব্যতীত বাকী সকল প্রকার কুকুর হত্যা করা জায়িয নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুকর হত্যা করার বিধান ছিল, পরে তা রহিত হয়েছে।

জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.
>
> আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ স. কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন। এমনকি কোনো মহিলা গ্রাম থেকে তার কুকুর নিয়ে আসত, তখন আমরা তাকে হত্যা করতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ স. কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "তোমরা (কেবল) দুই ফোঁটা বিশিষ্ট নিকষ কালো বেওয়ারিশ কুকুরকে হত্যা কর। কেননা, তা শয়তান।"[৩১]

৮. রোগাক্রান্ত প্রাণী

শায়খ উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেন, "যখন কোনো প্রাণী অসুস্থ হয়, যদি তা হারাম প্রাণী হয় ও তাদের আরোগ্য লাভ করার আশা করা না যায়, তখন তাকে হত্যা করতে বাধা নেই। কেননা, তাকে জীবিত রাখলে তাতে তোমাদের সম্পদ নষ্ট হবে। কেননা, তার খরচ বহন করতে হবে, যা অনর্থক নতুবা তাকে খাবার ও পানীয় বিহীন মৃত্যু পর্যন্ত রেখে দিতে হবে। তাও হারাম। কেননা, নবী স. বলেছেন, জনৈকা মহিলা এক বিড়ালকে বন্দী করে রাখার কারণে জাহান্নামী হয়েছে যে তাকে খাবার দেয়নি ও মুক্তিও দেয়নি, যাতে সে যমীনের কীটমুষিকাদি খেতে পারে। আর যে প্রাণীটি হালাল হয় আর তা দ্বারা কল্যাণ অর্জন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তা হারাম প্রাণীর মত। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা যাবে যবেহের মাধ্যমে বা বন্দুকের গুলির মাধ্যমে। তার জন্য যেটা আরামদায়ক তাই করা হবে; কেননা, নবী স. ইরশাদ করেন, যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন তোমরা সুন্দরভাবে হত্যা কর আর যখন যবেহ করবে তখন তোমরা সুন্দরভাবে যবেহ করবে আর তোমাদের প্রত্যেকেই ছুরিতে ধার দিবে যাতে জন্তু আরাম পায়"।[৩২]

"ইসলাম অন লাইনের এক ফতওয়ায় বলা হয়েছে, "শাফিয়ী, আবু দাউদ, হাকিম প্রমুখ আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. ইরশাদ করেন, কোনো

---

৩১. মুসলিম, *আসসহীহ*, পরিচ্ছেদ: (الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ), খ. ৩, পৃ. ১২০০, হাদীস নং ১৫৭২

৩২. https://islamqa.info/ar/8814|"

মানুষ কোনো চড়ুইপাখি বা আরও বড় কোনো প্রাণীকে যথার্থ হক ব্যতীত হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার থেকে হত্যার কৈফিয়ত চাইবেন। এক সাহাবী বললেন, তার কি হক? তিনি বললেন, তাকে যবেহ করে ভক্ষণ করা, তার মাথা কেটে ফেলে না দেওয়া। তাই কোনো হালাল চড়ুই পাখি হত্যা করে না খেয়ে ফেলে দেয়া নিষিদ্ধ। আর অনর্থক হারাম প্রাণী হত্যা করাও নিষিদ্ধ। ইমাম শাফিয়ী স্পষ্টভাবে বলেছেন, হারাম প্রাণী বয়সের কারণে, এমনকি তাকে আরাম দেয়ার উদ্দেশ্যেও হত্যা করা নিষিদ্ধ। তবে কেউ যদি তার চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য যবেহ করে, তবে তা হারাম হবে না। কেননা, তাও একটি মহৎ উদ্দেশ্য। তেমনি যদি তার গোশত চিড়িয়াখানায় বিদ্যমান প্রাণীর জন্য খাবার হিসেবে পেশ করে, তবে তাও বৈধ। কেননা, চিড়িয়াখানা তৈরি ও সংরক্ষণও বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা প্রাণীদের স্বভাব নিয়ে অবগত হওয়া যায় ও তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি তাদের হাড়, খুর ও পশম দ্বারা উপকৃত হওয়াও বিধিসম্মত। এর জন্য প্রাণী হত্যা করা যাবে। তারা রোগাক্রান্ত হোক বা না হোক। তাই প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ, যদি কোনো যথার্থ উপকারিতা না থাকে। যেমন কোনো প্রাণী বা পাখিকে তীর বা বন্দুকের গুলি ছুঁড়ার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা। সহীহ মুসলিমে এসেছে, "তোমরা প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত কর না"।[৩৩]

৯. হারাম এলাকার[৩৪] বন্যপ্রাণী

হারামে যে কোনো বন্য প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ। তবে সেখানেও কষ্টদায়ক প্রাণীগুলি হত্যা করা বৈধ। হাদীছে এধরণের পাঁচটি প্রাণীর কথা এসেছে। পরবর্তীতে এর আলোচনা আসছে।

কোন্ প্রাণী হত্যা করা বৈধ

ইসলামে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে প্রাণীদের হত্যা করতে বাধা নেই। নিম্নে যেসব প্রাণী হত্যা করা বৈধ এবং তাদের হত্যা বৈধ হওয়ার কারণ তুলে ধরা হলো:

১. হালাল প্রাণী

হালাল প্রাণী আহারের উদ্দেশ্য যবেহ করা যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورَةً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَتْلِهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا، فَيَرْمِيَ بِهَا.

---

৩৩. http://fatwa.islamonline.net/3446

৩৪. হারাম বলতে মক্কা শরীফে কাবার চতুর্দিকে সম্মানযোগ্য পবিত্র স্থানকে বুঝানো হয়। যার সীমানা আনুমানিক ছয় মাইল।

"যে ব্যক্তি কোনো চড়ুই পাখি বা তার চেয়ে বড় কোনো প্রাণী অন্যায়ভাবে হত্যা করল, আল্লাহ তার কাছে তার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার কি হক? তিনি বলেন, তাকে যবেহ করবে, অতঃপর তাকে ভক্ষণ করবে আর তার মাথা কেটে ফেলে দিবে না"।[৩৫]

২. কষ্টদায়ক হারাম প্রাণী

যে সকল প্রাণী কষ্ট দেয় তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। নিম্নে তাদের কিছু তালিকা তুলে ধরা হলো।

ক) **সাপ** : সাপ কষ্টদায়ক প্রাণী। তাই তাকে হত্যা করা বৈধ। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ

"পাঁচটি সীমালংঘনকারী প্রাণী তাদেরকে হিল (হারাম ও হাজীদের মীকাতের মাঝখানের স্থান) ও হারামে হত্যা করা যাবে। এগুলো হলো, সাপ, পেটে বা পিঠে দাগযুক্ত কাক, ইঁদুর, পাগলা কুকুর ও চিল"।[৩৬]

খ) সাদা-কালো দাগযুক্ত কাক: যাদেরকে ডোরা কাক বলা হয়। যার পেট বা পিঠে সাদা দাগ রয়েছে।

গ) **ইঁদুর:** কেননা ইঁদুর মানুষের আহার নষ্ট করে দেয় ও অনেক সময় বিভিন্ন পাত্রে মুখ দিয়ে নষ্ট করে দেয়।

ঘ) পাগলা কুকুর: যে কুকুর মানুষকে দংশন করে।

ঙ) চিল: যে বিভিন্ন গৃহপালিত মুরগী ইত্যাদির উপর আক্রমণ করে।

চ) মশা: মানুষকে আরামে ঘুম যেতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

ছ) মাছি: মাছি বিভিন্ন খাবারে মুখ রাখে, যার কারণে বিভিন্ন প্রকার রোগ সৃষ্টি হয়।

জ) ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ: মানুষের খাবারকে নাপাক করে ফেলে।

ঝ) বিচ্ছু: মানুষকে কামড় দেয় ও দংশন করে।

ঞ) উকুন : মানুষের চুলের গোড়া নষ্ট করে ও মানুষের জীবনযাত্রাকে অসহ্য করে ফেলে।

৩. দংশনকারী প্রাণী

দংশনকারী পিঁপড়া: যে সকল পিঁপড়া দংশন করে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

---

[৩৫] আবু আব্দুর রহমান আহমদ নাসাঈ, *আস সুনানুল কুবরা* (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি/২০০১খ্রি), খ. ৭, পৃ. ২৩৬, হাদীস নং ৪৩৬০

[৩৬] বুখারী, *আস সহীহ*, পরিচ্ছেদ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ), খ. ৪, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ৩০৮৭

أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟

"একবার এক পিঁপড়া এক নবীকে কামড় দিল। তখন তিনি পিঁপড়ার গ্রামকে জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন। তখন আল্লাহ তার নিকট ওহী পাঠালেন যে, তোমাকে একটি পিঁপড়া কামড় দেয়ার কারণে কি এমন এক উম্মতকে ধ্বংস করেছ, যে তাসবীহ পড়ছে"।[৩৭]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً.

"একবার এক গাছের নিচে এক নবী অবতরণ করলেন, তখন তাকে এক পিঁপড়া কামড় দিল, তখন তিনি সৈন্য প্রস্তুত করলেন ও তাদেরকে নিচ থেকে বের করলেন। অতঃপর তাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করলেন। তখন আল্লাহ তার নিকট ওহী পাঠালেন যে, তুমি শুধু আক্রমনকারী পিঁপড়াটিকে কেন হত্যা করনি?"[৩৮]

ইবরাহীম নাখয়ী [৪৭-৯৬হি.] বলেন:

إِذَا آذَاكَ النَّمْلُ فَاقْتُلْهُ.

"যখন তোমাকে কোনো পিঁপড়া কষ্ট দেবে, তখন তুমি তাকে হত্যা কর"।[৩৯]

খালিদ ইবনে দীনার রহ. বলেন:

رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ رَأَى نَمْلاً عَلَى بِسَاطٍ فَقَتَلَهُنَّ.

"আমি আবুল আলিয়াকে দেখেছি, তিনি তার বিছানায় একটি পিঁপড়া দেখলেন, তখন তাকে হত্যা করলেন"।[৪০]

৪. প্রয়োজনীয় প্রাণী

বিভিন্ন প্রয়োজনেও প্রাণী হত্যা করা বৈধ। যেমন-

ক) কোনো প্রাণী চিকিৎসার ঔষধ তৈরি করার জন্য হত্যা করা বৈধ।

খ) কোনো প্রাণী যদি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় এবং তার চামড়া কাজে ব্যবহার করা যায় বা তার গোশত কোনো চিড়িয়াখানার অন্য কারও খাবার হয়, তাহলে তাকেও হত্যা করা বৈধ।

---

৩৭. মুসলিম, *আস সাহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৫৯, হাদীস নং ২২৪১

৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৫৯, হাদীস নং ২২৪১

৩৯. ইবন আবি শায়বা, *মুসান্নাফ*, খ. ৯, পৃ. ১১০, হাদীস নং ২৭১৮৯

৪০. প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১১০, হাদীস নং ২৭১৯০

আল-মওসুয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাতে বর্ণিত হয়েছে:

> "ফুকাহায়ে কিরাম হারাম প্রাণীর চামড়া, পশম ও চুল দিয়ে উপকৃত হওয়ার জন্য শিকার ও যবেহ হালাল হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেন। শাফিয়ীগণ বলেন, উপকৃত হওয়ার জন্য হারাম প্রাণী যবেহ করা যেমন খচ্চর, গাধা এবং তাদের চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম। কেননা ভক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রাণী যবেহ নিষিদ্ধ। আর হানাফীগণ বলেন, হারাম প্রাণীর চামড়া, পশম বা চুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য শিকার করা হালাল। কেননা, উপকার অর্জনও একটি বিধিসম্মত উদ্দেশ্য। মালিকী ফকীহদের মতও তাই। হাম্বলীদের এ ব্যাপারে কোনো মতামত নেই।"[৪১]

৫. ঘৃণিত প্রাণী

যে সকল প্রাণী কোনো না কোনো কারণে অভিশপ্ত হয়েছে তাদের হত্যা করা বৈধ।

ক). শূকর হত্যা করা

ঘৃণিত প্রাণী হিসেবে শূকর হত্যা করা বৈধ। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

> وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.
>
> "ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! অতিসত্বর তোমাদের মাঝে ইবন মারয়াম আ. অবতীর্ণ হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে। তখন তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন, শূকর হত্যা করবেন, কর রহিত করবেন ও সম্পদ এভাবে বেড়ে যাবে যে, কেউ কারো সম্পদ গ্রহণ করবে না।"[৪২]

খ). টিকটিকি (وزغة/أبو بريص) (Gecko)

এটাকে আরবীতে আবু বুরাইছ বলা হয়। সাধারণত তা টিকটিকির এক প্রজাতি। টিকটিকি বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। হাদীছে যার কথা এসেছে তা একটু বড় আকারের। গায়ে ফুট ফুট। তার চামড়া পাতলা। তার লাল ও সবুজ মিশ্রিত গায়ে কাল দাগ রয়েছে। জিহ্বা লাল। তার খাবার হলো মশা ও ছোট ছোট পোকা মাকড়। তার মাথা একটু বড়। তবে বাসার মধ্যে যে ছোট টিকটিকি রয়েছে তাকেও অনেকে হত্যা করে

---

৪১. *আল মওসুয়াতুল ফিকহিয়্যা আল কুয়াইতিয়া*, (কুয়েত: ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনুল ইসলামিয়া, ১৪০৪-১৪২৭হি.), খ. ৭, পৃ. ৯৭

৪২. মুসলিম, *আস সহীহ* (نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ), খ. ১, পৃ. ১৩৫, হাদীস নং ২৪২

সে সওয়াবের আশা করে। কেননা, তাদের একটি প্রকার বড় হয়েই সেই রকম হয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ.

"যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে টিকটিকি হত্যা করবে, সে এত এত পুণ্য পাবে। আর যে ব্যক্তি তাকে দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করবে, সে প্রথম আঘাতে হত্যা করার চেয়ে কম এত এত পুণ্য পাবে আর যদি তাকে তৃতীয় আঘাতে হত্যা করে, সে এত এত পুণ্য পাবে যা দ্বিতীয় আঘাতে হত্যার চেয়ে কম।"[৪৩]

অন্য বর্ণনায় সওয়াবের পরিমাণের ব্যাখ্যা এভাবে এসেছে:

مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ.

"যে ব্যক্তি কোনো টিকটিকি প্রথম আঘাতে হত্যা করবে তার জন্য একশ পুণ্য লিখা হবে আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করবে সে তার চেয়ে কম পাবে আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে হত্যা করবে সে তার চেয়ে কম পাবে"।[৪৪]

শায়খ উসাইমিন বলেন:

والوزغ سام أبرص، هذا الذي يأتي في البيوت يبيض ويفرخ ويؤذي الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وكان عند عائشة رضي الله عنها رمح بها تتبع الأوزاغ وتقتلها.

"ওয়াযগ হলো টিকটিকি, যে মানুষের ঘরে বসবাস করে ডিম পাড়ে ও বাচ্চা জন্ম দেয় আর মানুষকে কষ্ট দেয়। নবী স. তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। আয়িশা রা.-এর নিকট একটি তীর থাকত, যা দ্বারা তিনি টিকটিকি তালাশ করতেন ও তাকে হত্যা করতেন।"[৪৫]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً.

"এক আঘাতে টিকটিকি হত্যা করলে সত্তরটি পুণ্য পাবে"।[৪৬]

মুফাসসির ইসমাঈল হাক্কী রহ. বলেন, "যে সকল প্রাণীর স্বভাব কষ্ট দেয়া তাকে তার কষ্ট প্রদানের কারণে হত্যা করা বৈধ। যেমন, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, টিকটিকি ইত্যাদি। হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ খাব্বাযীর হাশিয়াতে এসেছে- জীব হত্যা করা হয়ত ক্ষতি দূর

---

৪৩. মুসলিম, প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ : (اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ), খ..৪, পৃ. ১৭৫৮, হাদীস নং ২২৪০

৪৪. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ : (اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ), খ. ৪, পৃ. ১৭৫৮, হাদীস নং ২২৪০

৪৫. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index

৪৬. মুসলিম, *আস সাহীহ*, পরিচ্ছেদ: (اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ), খ. ৪, পৃ. ১৭৫৯, হাদীস নং ১৪৭

করার জন্য বা কল্যাণ অর্জনের জন্য বৈধ। মৌমাছি ও রেশমের পোকা হত্যাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত; যদি তাদের হত্যা ব্যতীত কল্যাণ অর্জন সম্ভব না হয়। কথিত আছে যে, সাপ তার খারাপ আচরণ প্রকাশ করেছে আদমের সাথে খিয়ানত করার মাধ্যমে। সে ইবলিসকে মুখে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে। সে যদি তাকে ভীতি প্রদর্শন করত ইবলিস জান্নাতে কখনও প্রবেশ করতে পারত না। তাই রাসূলুল্লাহ স. তাকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তাকে তোমরা হত্যা কর, যদিও নামাযে থাক। অর্থাৎ সাপ ও বিচ্ছুকে। আর সকল প্রাণীদের মধ্যে টিকটিকিই ইবরাহীম আ.-এর আগুনে ফুৎকার দিয়েছিল; তাই তাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। ... তদুপরি টিকটিকি বিষাক্ত। খাবার নষ্ট করে, বিশেষ করে লবণকে নষ্ট করে ফেলে। আর যদি সে নষ্ট করার কোনো বস্তু না পায়, সে ছাদে উঠে খাবারের বরাবর উঁচু জায়গা থেকে সে তার বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে। এভাবে সে খাবারকে অপবিত্র ও নষ্ঠ করে দেয়। আর ইঁদুর তার কৃতিত্ব দেখিয়েছে নূহ আ.-এর কিস্তি তে। তাকে সে ছিদ্র করে ফেলেছে। আর কাক তার খারাপ কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাকে যখন নূহ আ. যমীনের সংবাদ গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তখন সে মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল আর কিস্তি থেকে নেমে গেল। তেমনি চিল, হিংস্র প্রাণী ও পাগলা কুকুর সকলে সাপের মত। আর ক্ষতিকারক বস্তু হত্যা করা ক্ষতি দূর করার নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত।[৪৭]

হত্যা করার বৈধ পদ্ধতি

যে সকল প্রাণীকে হত্যা করা বৈধ তাদেরকে নিয়ম মেনে হত্যা করতে হবে। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা বৈধ নয়। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> ثِنْتَان حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.
>
> "দুটি বিষয় আমি রাসূলুল্লাহ স. থেকে স্মরণ রেখেছি। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে দয়ার ফায়সালা রেখেছেন। তাই তোমরা যখন হত্যা করবে সুন্দরভাবে হত্যা কর আর যখন যবেহ করবে সুন্দরভাবে যবেহ কর আর তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের ছুরিতে শান দেবে, যাতে জন্তু স্বস্তি পায়।"।[৪৮]

তাই হারাম প্রাণীকে আগুন ব্যতীত সকল পন্থায় হত্যা করা বৈধ। আর যে পদ্ধতিতে দ্রুত নিহত হবে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করাই উত্তম। আর হালাল প্রাণীকে সুন্দরভাবে যবেহ করতে হবে।

---

৪৭. ইসমাইল হাক্কী, *রুহুল বয়ান* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা বি.), খ. ১, পৃ. ১১২

৪৮. মুসলিম, *আসসহীহ*, পরিচ্ছেদ: (الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ), খ. ৩, পৃ. ১৫৪৮, হাদীস নং ১৯৫৫।

আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا» وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। একসময় তিনি তার কোন এক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। তখন আমরা একটি চড়ুইপাখি দেখলাম, যার সাথে দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা তার বাচ্চাদুটি ধরলাম। অতঃপর চড়ুই পাখিটি এসে তার ডানা নাড়তে লাগল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ স. এসে বললেন, তোমাদের কে একে তার সন্তান দিয়ে কষ্ট দিয়েছে? তার সন্তান তার নিকট ফিরিয়ে দাও। তিনি পিঁপড়ার এক গ্রাম দেখলেন, যাকে আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, কে তাদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে? আমরা বললাম, আমরাই করেছি। তিনি বললেন, আগুন দ্বারা আগুনের প্রভু ব্যতীত কারও শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।"[৪৯]

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

"রাসূলুল্লাহ্ স. যে কোনো প্রাণীকে বন্দী করে রেখে হত্যা করা থেকে নিষেধ করেছেন"।[৫০]

ইবনে আব্বাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন:

نَهَى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

"তিনি যে কোনো প্রাণী বন্দী করে রেখে হত্যা করা থেকে নিষেধ করেছেন"।[৫১]

কুরবানী ও প্রাণী হত্যা কি অমানবিক?

অনেক অমুসলিম, আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও কোনো কোনো ধর্মাবলম্বী কুরবানী নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। পশু হত্যা নিয়ে তারা নানা প্রশ্ন করে থাকে। তারা তাকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে থাকে। তাদের ধারণা মতে কুরবানী অপচয়ের শামিল।

---

৪৯. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ, *আস সুনান*, তাহকিক: মুহাম্মদ মহিউদ্দীন (বৈরূত: আল মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, তা বি.), পরিচ্ছেদ: (فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ), খ. ৩, পৃ. ৫৫, হাদীস নং ২৬৭৫

৫০. মুসলিম, *আসসাহীহ*, পরিচ্ছেদ : (النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ), খ. ৩, পৃ. ১৫৫০, হাদীস নং ১৯৫৯।

৫১. আবুল কাসেম সুলাইমান তাবরানী, *আল মু'জামুল কবির* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরবি, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৪৬, হাদীস নং ১২৪৩০

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুফাসসির সাইয়্যেদ রশীদ রেযা [১৮৬৫-১৯৩৫খ্রি.] বলেন,

"কিছু ব্রাহ্মণ ও দার্শনিক বলেন, খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো প্রাণী যবেহ ও শিকার করা গর্হিত। কোনো বিবেকবান ব্যক্তি তা করতে পারে না। আর নিজের চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য কোনো জীবকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। এ মূলনীতির আলোকে আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতসমূহের উপর প্রশ্ন জাগে, যেখানে প্রাণী ভক্ষণের অনুমতি রয়েছে। যেমন মূসা আ., ঈসা আ. ও মুহাম্মদ স. প্রমুখ নবীর শরী'আত। মানুষেরা এ ব্যাপারে আরব দার্শনিক আবুল আলা মা'আররীর সমালোচনা করে যে, সে ঘৃণার কারণে গোশ্‌ত খেত না। বরং তাকে পাশবিক মনে করত। স্বভাবজাত ঘৃণার কারণে নয়; বরং তাকে অমানবিক মনে করে সে তা খেত না। অনেকেই এমনটি করে থাকে। তার ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি অসুস্থ হলে ডাক্তার তাকে মুরগীর গোশত খেতে বললেন। অতঃপর তা রান্না করে আনা হলে তিনি গোশতের উপর নিজের হাত রেখে বললেন, তারা তোমাকে দুর্বল ভেবেছে; তাই তারা তোমার জন্য এটি খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তারা কেন তোমাকে বাঘের বাচ্চা ভাবেনি?

এই ধরনের প্রশ্নের জবাব হলো, আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতসমূহ মানুষের জন্য জীব খাওয়ার অনুমোদন না দিলে সৃষ্টির শৃঙ্খলার উপর প্রশ্ন ওঠত। কেননা, প্রভুর সুন্নাত হলো, জলে-স্থলে একটি প্রাণী অপর প্রাণীকে ভক্ষণ করা। তাই মানুষ সেরকম ভক্ষণ করার বেশি হকদার। কেননা, মহান আল্লাহ তাকে সকল প্রাণীর উপর মর্যাদা দিয়েছেন ও সকল প্রাণীকে তাদের অনুগত করেছেন, যেভাবে যমীনের সকল বস্তু ও শক্তিকে তাদের অনুগত করেছেন। যাতে সে তা দ্বারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে, ইবাদত করতে পারে ও সৃষ্টি জগতের মাঝে তার নিদর্শন ও লোকায়িত বিজ্ঞান, আশ্চর্যাবলি, সূক্ষ্মবিষয় ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে। মানুষ এসকল জানোয়ার ভক্ষণ ছেড়ে দিলেও তারা মৃত্যু বা ধ্বংস থেকে বা হিংস্র প্রাণীদের হামলা থেকে রেহাই পেতে পারবে না। অনেক সময় শরয়ী পদ্ধতিতে যবেহ করা তাদের বিভিন্ন প্রকার মৃত্যুর কষ্ট থেকে হালকা হয়। তা প্রাণীদের প্রতি এক প্রকার দরদের বহিঃপ্রকাশ। অনেক সময় ছাগল যখন বাঘের ঘ্রাণ পায় বা তার আওয়াজ শুনে তখন তার শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনি মোরগের অবস্থা নেকড়ের সাথে ও সকল হিংস্র প্রাণীর সাথে। আর যবেহের ব্যথা সামান্য সময় হয়। জীব বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রাণী ও জানোয়ারদের ব্যথার অনুভব মানুষের ব্যথার অনুভবের চেয়ে দুর্বল। তাই প্রাণীদের যবেহ করা পাশবিক নয়।"[৫২]

---

৫২. মুহাম্মদ রশিদ, *তাফসীরুল হাকিম* (মিসরঃ আল হাইয়াতুল মিসরিয়া আল আম্মাহ, ১৯৯০খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৬৫

জিন হত্যা

প্রাণী জগতে জিন বিশেষ এক শ্রেণি এবং মানুষের সাথে সাথে তারাও পরকালে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। অনেক সময় জিন বিভিন্ন আকৃতিতে মানুষের ঘর-বাড়িতে প্রবেশ করে থাকে। তাই তাদের হত্যার বিধান জেনে নেয়া আমাদের অতীব প্রয়োজন। কিছু জিন সাপের আকৃতিতে মানুষের ক্ষতি করে তাদের হত্যা করতে নিষেধ নেই।

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রা.-এর আযাদকৃত দাসী সা'য়িবাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ. إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ. فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ. وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.
>
> "নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ স. ঘরে বসবাসকারী জিনদের (সাপ) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তবে যে সকল সাপের পিঠে দুটি সাদা রেখা থাকবে বা লেজকাটা হবে তারা ব্যতীত। কেননা, তারা দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেয় ও মহিলাদের গর্ভপাত করে"।[৫৩]

হানাফীগণ ব্যতীত অন্যান্য ফকীহ ঘরের সাপ ও বাইরের সাপের ব্যাপারে পৃথক বিধান দিয়েছেন। তাদের মতে, অনাবাদীর সাপ সাধারণভাবে ভীতি প্রদর্শনবিহীন হত্যা করা হবে। কেননা, তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের সাপকে হত্যা করার পূর্বে তিনবার সতর্ক করা হবে। হানাফীগণ তাতে পার্থক্য করে না। তাহাবী রহ. বলেন, সকলকে হত্যা করতে বাধা নেই। কেননা, নবী স. জিনদের সাথে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা যেন তার উম্মতের ঘরে প্রবেশ না করে আর তাদেরকে প্রকাশ না করে। তাই তারা যদি বিরোধিতা করে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করল, তাই তাদের হত্যা করা হারাম হবে না। তা সত্ত্বেও যাদের মাঝে জিনদের আলামত পাওয়া যাবে তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। তবে তা তাদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হবার কারণে নয়; বরং তাদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য ক্ষতি দূরীভূত করার মানসে।[৫৪]

মহানবী স. বলেন:

> إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّارًا، فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاَثًا، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُنَّ.
>
> "নিশ্চয় তোমাদের ঘরকে আবাদকারী রয়েছে; তাই তাদেরকে তিনবার সতর্ক করে দাও। যদি তার পরেও তাদের কাউকে দেখা যায় তখন তাদেরকে হত্যা কর"।[৫৫]

---

৫৩. মালিক ইব্‌ন আনাস, *আল মুয়াত্তা*, তাহকিক: বাশশার আওয়াদ মারুফ ও মাহমুদ খলিল (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রেসালা, ১৪১২হি.), খ. ৫, পৃ. ১৪২২, হাদীস নং ৩৫৮০।

৫৪. *মওসুয়া ফিকহিয়্যা কুয়িতিয়া*, খ. ১৭, পৃ. ২৮২।

৫৫. তিরমিযী, *আসসুনান*, খ. ৩, পৃ. ১২৯, হাদীস নাং ১৪৮৪।

তবে সাধারণভাবে কোনো কারণ ব্যতীত তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়।

ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجَانِّ

"রাসূলুল্লাহ স. জিনদের হত্যা থেকে নিষেধ করেছেন"।[৫৬]

বিশিষ্ট ফকীহ আবুল মা'আলী বুরহানুদ্দীন রহ. বলেন,

"কতিপয় মাশা'য়িখের মতে, (সালাতরত অবস্থায়) সাপ জিন না হলে হত্যা করা বৈধ আর জিন হলে অবৈধ। এ বিষয়ে মূলকথা হলো রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী। তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদেরকে সাদা সাপ থেকে বিরত রাখ; কেননা, তারা জিন। তাঁদের মতে, সালাত আদায়রত অবস্থা ছাড়াও সাপ জিন না হলে হত্যা করা বৈধ আর জিন হলে ভীতি প্রদর্শনের পরে হত্যা করা বৈধ। আর ভীতি প্রদর্শনের পদ্ধতি হলো তাকে বলবে "মুসলিমদের রাস্তা উন্মুক্ত করে দাও"। তার পরেও রয়ে গেলে তাকে হত্যা করবে। আর যাঁরা বলেন, সালাতরত অবস্থায় জিন ও গায়রে জিন সকলকে হত্যা করা বৈধ, তাঁদের মতে সালাতের বাইরেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য। এটিই বিশুদ্ধ মাযহাব। কেননা, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা দুই কালোকে (অর্থাৎ সাপ ও বিচ্ছু) হত্যা কর। তিনি তাতে পার্থক্য করেননি। রাসূলুল্লাহ স. জিনদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তারা যেন তাঁর উম্মতের ঘরে প্রবেশ না করে আর যদি ঘরে প্রবেশ করে, তবে তারা যেন প্রকাশিত না হয়। এরপরও যদি তারা তা করে, তবে তাদের প্রতি কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না। তাই যে নিজেকে রাসূলুল্লাহ স.-এর উম্মতের নিকট ঘরে প্রবেশ করে নিজেকে প্রকাশ করল, সে যেন অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। এভাবে সে হত্যাযোগ্য অপরাধে লিপ্ত হল।"[৫৭]

ভুলে প্রাণী হত্যা

ভুলে কোন প্রাণী হত্যা করা হলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আশা করা যায়, আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

ইবন আব্বাস সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স.বলেন:

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মত থেকে অনিচ্ছাকৃত কাজ, ভুল ও জোরপূর্বক কাজ ক্ষমা করে দেন "।[৫৮]

---

৫৬. মা'মর ইব্‌ন আবী আমর, *জামে' মামর*, তাহকিক: হাবিবুর রহমান আযমী (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩হি), খ. ১০, পৃ. ৪৩৫, হাদীস নং ১৯৬১৯

৫৭. আবুল মাআলী বুহানুদ্দীন, *আল মুহীতুল বুরহানী ফিল ফিকহিন নুমানী* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২০০৪খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৯৪.

৫৮. ইব্‌ন মাজাহ, *সুনান*, খ. ১, পৃ. ৬৫৯, হাদীস নং ২০৪৫

কেউ ভুলে যদি কোনো প্রাণী হত্যা করে, তখন মালিক পাওয়া গেলে জরিমানা দিতে হবে। আর কারও মালিকানা পাওয়া না গেলে জরিমানা দিতে হবে না। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।

যুদ্ধে প্রাণী হত্যা

যুদ্ধের মধ্যে অনেক সময় শত্রুপক্ষকে দমন করার জন্য প্রাণী হত্যার প্রয়োজনবোধ হয়। এরূপ অবস্থায় প্রাণী হত্যা করা বৈধ। যেমন জামালের যুদ্ধে আয়িশা রা. কে দমন করার জন্য তার উটের পা কেটে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদেরকে পরাজিত করা সহজ হয়।

রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রয়োজনে সকল প্রাণী হত্যা করা বৈধ। কেননা, তাদের প্রাণীকে হত্যা করলে তাদের হত্যা ও পরাজয় ত্বরান্বিত হবে। মালিকীগণ বলেন, অগ্রগণ্য মত হলো, যুদ্ধে প্রাণী হত্যার পর তাকে জ্বালিয়ে ফেলা ওয়াজিব, যদি শত্রুরা তাদের ধর্ম মতে মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে বৈধ মনে করে। কেউ কেউ বলেন, যদি তা নষ্ট হওয়ার পূর্বে তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে, তবেই জ্বালিয়ে ফেলা ওয়াজিব, নতুবা ওয়াজিব হবে না। কারণ এর উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন এ থেকে ফায়দা অর্জন করতে না পারে। পক্ষান্তরে যুদ্ধাবস্থা বা রণাঙ্গণ ভিন্ন অন্য জায়গা হলে হানাফী ও মালিকীগণ বলেন, তাদের প্রাণীর পা কেটে দেয়া বৈধ। কেননা, তা তাদের রাগের কারণ ও তাদের শক্তি দুর্বল করে দেওয়ার উপলক্ষ। তাই তাদের হত্যা করা যুদ্ধে হত্যা করার মত। আর শাফিয়ী এবং হাম্বলীগণ বলেন, তা বৈধ নয়। কেননা, নবী স. বন্দী করে রেখে প্রাণী হত্যা করা থেকে নিষেধ করেছেন। আবূ বকর সিদ্দিক রা. ইয়াযিদ ইবন আবি সুফিয়ান রা.কে অসীয়ত করে বলেন, "তুমি ফলদার গাছ কেটে ফেলবে না এবং খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো প্রাণী ও ছাগলকে হত্যা করবে না।"[৫৯] এটিই বিশুদ্ধমত।

উপসংহার

প্রত্যেক প্রাণীর মালিক মহান রাব্বুল আলমীন। তিনি তাদের রিয্কের ব্যবস্থা করেন। তিনি ব্যতীত কারও কোনো প্রাণী সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। প্রাণীদেরকে হত্যা করা সাধারণত ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে ভক্ষণের উদ্দেশ্য হালাল প্রাণী হত্যার করার বিধান ইসলামে রয়েছে। তাছাড়া কষ্টদায়ক, ক্ষতিকর ও ঘৃণিত প্রাণী হত্যা করাও ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ। প্রাণীদের দ্বারা যদি কোনো চিকিৎসা বা ঔষধ তৈরি করা হয়, তখন সে কারণেও প্রাণীদেরকে হত্যা করা যাবে। আর যখন তাদেরকে হত্যা করা হবে তখন ধারালো ছুরি ইত্যাদি দ্বারা হত্যা করতে হবে, যাতে তাদের কষ্ট না হয়।

---

৫৯. *আল-মাওসূয়্যাহ আল-ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৬, পৃ. ১৫৬

REG.NO.DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: APRIL-JUNE : 2016: Tk. 100/-